বৈদিক বিপ্লব

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
ইং ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
Email : bbt_sukhchar@yahoo.co.in
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুখবন্ধ

এই অনন্ত সৃষ্টির জলে স্থলে অন্তরিক্ষে অহোরহ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব নব সৃষ্টির দিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুই স্থিতিশীল নয়। প্রতিনিয়ত পরিবর্তন অর্থাৎ চৈতন্যের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জীবজগৎ অনন্তগতির পথে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ করছেন প্রতিক্ষণে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। একদিকে তার নয়নাভিরাম সৃষ্টি, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, সমুদ্র, গাছপালা, বনজঙ্গল। অন্যদিকে ভয়ঙ্কর প্রলয়, ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, দাবানল, অগ্ন্যুৎপাত। এইভাবেই প্রকৃতির রাজ্যে চলেছে এক মহাচৈতন্যের বিপ্লব।

সৃষ্টির আদিতে কোন কিছুই ছিল না। ক্রমে ক্রমে আবর্তনে বিবর্তনে মেঘ, বৃষ্টি, জল, আলো, বাতাস, মাটি, গাছপালা, জীবজন্তু ও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃষ্টি হলো। এইভাবে যুগ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এলো আদিম যুগ, প্রস্তর যুগ। ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনের ধারা ধরে এলো জ্ঞানের যুগ অর্থাৎ বৈদিক যুগ বা বেদের যুগ।

বেদ অর্থাৎ অভেদ বা সাম্যের যুগের ঋষিরা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বুঝের জায়গায় বুঝ লাঠির জায়গায় লাঠি প্রয়োগ করেছিলেন। তার ফলস্বরূপ সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন হয়েছিল। তৎকালীন সমাজেও ছিল বিপ্লব। সেই বিপ্লব, জ্ঞানের বিপ্লব, চৈতন্যের বিপ্লব, বৈদিক বিপ্লব। যেথায় নেই কোন ভেদাভেদ, তাইতো বেদ। বেদ অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানের বিকাশই বিজ্ঞান। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের বিপ্লব তারা করেছিলেন সমাজের বুকে।

বৈদিক যুগের মানুষেরা প্রকৃতিকে অনুসরণ করে চলতেন। সেই যুগে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছুই ছিল না; 'আমার' বলে কিছুই ছিল না। সবই ছিল 'আমাদের', সবই ছিল ব্যাপ্তিকেন্দ্রিক। এরফলে তখনকার সমাজে অভাব অভিযোগ বলে কোন কথাই ছিল না। এমনকি সেই সময়ে সমাজে একটি ভিক্ষুকও ছিল না। কিন্তু আজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? শুধুই ভিক্ষুকের মিছিল।

আমরা বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ করে রাক্ষস, রক্ত শোষক অসুর, দানবদের সম্বন্ধে জানতে পারি। যদিও এরা দেখতে কেমন ছিল, সে সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে। এদের একটা মাথা না দশটা মাথা, কুলোর মত কান, হাতির মত পা, না কোদালের মতো দাঁত ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থকারেরা কল্পনার ভিত্তিতে নানা রূপদান করেছেন। সে যাই হোক, আজকের সমাজে আমাদের চারিদিকে যে সমস্ত শোষক, জোতদার, মজুতদার, মুনাফাখোর, ধর্ম ব্যবসায়ীদের দেখতে পাচ্ছি, যারা খুন, জখম, রাহাজানি করে, নিরীহ মানুষদের রক্ত শোষণ করে রক্তচোষার মত নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে সমাজকে আজ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, এদেরকেই হয়তো সেই যুগের মানুষ অসুর, দানব, রাক্ষস বলতো। সেই যুগে এই অসুর দানব রাক্ষসদের উৎখাতকল্পে ও এদের হাত থেকে সমাজকে উদ্ধার করার মানসে যাঁরা অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তাঁরাই আজ মহান হয়েছেন। আমরা যাঁদের দেবদেবী জ্ঞানে প্রতিদিন পূজা-অর্চনা করি, তাঁরা প্রত্যেকেই অসুর, দানব ও রাক্ষসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তাদের দমন করে দেবদেবী আখ্যা লাভ করেছেন। কিন্তু আজকের দিনে সেই সংগ্রাম কোথায়?

আজকের সমাজে যারা জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করছে, মা বোনেদের ইজ্জত লুট করছে, খাদ্যে ঔষধে ভেজাল দিচ্ছে — এইসব শোষক মজুতদার, মুনাফাখোরদের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে জনগণকে বিপ্লব করতেই হবে। জনজাগরণের মাধ্যমেই আসবে জনগণের সেই বিপ্লব। কিন্তু আজ জনগণ কি দিয়ে বিপ্লব করবে? অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বিপ্লব? বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেইসব বিপ্লব হয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। সেইসব বিপ্লব ছিল রক্ত ঝরানোর বিপ্লব। খুন আর খুনীর বিপ্লব। এই রক্ত ঝরানোর বিপ্লব কখনোই কোন দেশে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, পারবেও না। কারণ একটা খুন আর একটা খুনের জন্ম দেয়।

অথচ ধর্মে আছে বিপ্লবের কথা। বিপ্লব অর্থাৎ পরিবর্তনের কথা, অসুরকে সুরে আনার কথা। অসুর দমনের জন্য চাই অস্ত্র। সেই অস্ত্র জ্ঞানের

অস্ত্র, নাম সংকীর্তনের অস্ত্র। ধর্মে আছে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা। সশস্ত্র বিপ্লব তথাকথিত খুনোখুনীর বিপ্লব নয়। ডাক্তারের হাতের ছুরি আর খুনীর হাতের ছুরি এক নয়। ডাক্তার ছুরি দিয়ে রোগীর দেহের ক্লেদ পরিষ্কার করে রোগীকে নতুনভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণা জোগায়। আর খুনী সমাজকে বিষাক্ত করে, নিরীহ মানুষের প্রাণ হরণ করে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে।

সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন এই মাটিতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে, নামের অস্ত্র দিয়ে। দুষ্কৃতকারীরা, খুনীরা যে হাতে সমাজের বুকে কত রক্ত বন্যা বইয়েছে, সেই খুনীরাই আবার সেই হাতেই খোল করতাল বাজিয়ে নাম সংকীর্তনের জোয়ারে দেশ ভাসিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আজকের সমাজে রক্তপাত হানাহানি বন্ধ করে জোতদার, মজুতদার, মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গেলে চাই তথাকথিত অস্ত্রশস্ত্রের বিপ্লব নয়। চাই জ্ঞানের অস্ত্র, নামের অস্ত্র দ্বারা বৈদিক বিপ্লব। কেন না আত্মিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে একমাত্র বৈদিক বিপ্লবই আনতে পারে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ রক্ত হিসাবে এযুগের যুগত্রাতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ যে জ্ঞান অস্ত্র, নামের অস্ত্র বাহক হিসাবে বহন করে নিয়ে এসেছেন এই জগতের বুকে, সেই মহাকাশের মহানাম 'রাম নারায়ণ রাম' নামের অস্ত্র দিয়েই সম্ভব সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা। আসুন, আমরা তাঁর তত্ত্ব ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নামে গানে প্রেমে মুখর হয়ে সকল বিবাদ-বিচ্ছেদ ভুলে এক মহামিলনের সুরে মিলিত হয়ে বৈদিক বিপ্লবকে স্বাগত জানাই।

পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বেদতত্ত্ব কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন মীটিং ও ধর্মসভায় শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব পাণ্ডুলিপি, শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরু দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। তারজন্য একটি সংকলন বিভাগও গঠন করে নাম দিয়েছেন **'অভিনব দর্শন'**।

'অভিনব দর্শন' প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে ত্রয়োদশ শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হল, **বৈদিক বিপ্লব**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী । এছাড়া যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন, তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩ — *চপল মিত্র*
ইং ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ — *(প্রকাশক, সংকলক ও সংগ্রাহক)*

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেবতা সচেতন রয়েছে তোমার মধ্যে

বর্ধমান টাউন হল ময়দান, বর্ধমান
২৫শে মে, ১৯৭৪

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে বেদমন্ত্রের ধ্বনি .....

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে ছিল বেদের যুগ। সেই যুগে যখন বেদের শাসন ছিল, বেদজ্ঞরা পরম আনন্দে পরম সুরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশবাসীকে এই বেদের ধ্বনি শুনাতেন। তখন সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছিল। সমাজে কোনদিক থেকে কোন অভাব-অভিযোগ ছিল না। বেদজ্ঞরা সবাই বেড়িয়ে পড়তেন আর দ্বারে দ্বারে বেদমন্ত্র, বেদধ্বনি শুনাতেন। কি বলতেন তাঁরা এই বেদমন্ত্রের মাধ্যমে? তাঁরা বলতেন, আমাদের এই পৃথিবীর বুকে একই আকাশ, বাতাসের তলে, একই চন্দ্র সূর্যের তলে আমরা যারা বাস করি, সবাই একই পূর্বপুরুষের সন্তান। সুতরাং আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিচ্ছেদ, কোন বৈষম্য থাকবে না। আমরা সবাই একান্নভুক্ত, একই পরিবারভুক্ত। আমাদের জীবনের চলার পথে আমরা সেইভাবেই এমন করে গড়ে উঠবো যে, আমাদের ভিতরে কোন অভাব-অভিযোগ থাকবে না, কোন দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। ধর্মের দিক থেকে, রাজনীতির দিক থেকে থাকবে সমান সুর। আমরা বেদের পূজারী। বেদ হচ্ছে সমান সুর, সমতার সুর। সেই সমান সুরই সাম্যবাদের সুর। তাঁরা বলতেন, সমতার সুর নিয়েই আমরা সমাজকে ঢেলে সাজাব। সেই যুগে এত খাদ্য উৎপন্ন হতো যে, এক বছরের উৎপন্ন খাদ্যে চার বছর চলে যেত। সমস্ত খাদ্য মজুত থাকতো। শুধু মানুষের জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকতো না, জীবজন্তু, পশুপাখী সবার জন্য প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা থাকতো।

তখনকার যুগেও ধর্মের কথা ছিল। তখন কি ছিল ধর্মের কথা? আগে সমাজকে তৈরী কর। সমাজের ভিত গঠন কর। সমাজকে ঢালাই করে সুন্দর করে গড়ে তোল। এমন কোন কথা বলবে না, এমন কোন চিন্তা করবে না, যে চিন্তাকে কেন্দ্র করে তোমাদের মধ্যে কল্পনা ঢুকতে পারে, অবাস্তব সুর এবং নানারকম সংস্কার ঢুকতে পারে এবং যার ফলে সমাজে নানারকম অবাস্তবতা দেখা দিতে পারে। আজকের সমাজ ব্যবস্থায়, আজকের সমাজে তাই ঘটেছে। আজকের সমাজে, আজকের সমাজ ব্যবস্থায় তাই দেখা যাচ্ছে। তখনকার সময়ে সমাজে ছিল একতার সুর, একতার ধ্বনি। বেদজ্ঞরা সকলকে ধর্ম বোঝাতেন। শিব বেদের ব্যাখ্যা করতেন; বিষ্ণু বেদের ব্যাখ্যা রচনা করতেন। বেদ কোন মানুষের রচনা নয়। বেদ আকাশ থেকে সৃষ্ট। বেদ হচ্ছে আকাশের সুর। বেদ হচ্ছে জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি। বেদ হচ্ছে ধ্বনি, বেদ হচ্ছে মাটি, বেদ হচ্ছে আকাশ, বেদ হচ্ছে চেতন এবং সচেতন। তারা সেই সচেতনতার সুর দিয়েই সমাজকে সচেতন করে তুলতেন।

তখনকার সময়ে বেদজ্ঞরা যে ধর্মের কথা বলতেন, সেই ধর্ম বলতে কি বুঝা যেত? সেই সময়ে ধর্মে ছিল — সমাজে একজনও অনাহারে থাকবে না, অনাশ্রয়ে থাকবে না। যদি কারও অনাহারে মৃত্যু হত, সেজন্য তারা সমাজকে দায়ী করতেন। ধর্মের কথায় তারা বলতেন, প্রমাণবিহীন দেবতার কথা, ভগবানের কথা কেউ বলতে পারবে না। আমার পূর্বপুরুষরা বেদের ধারা নিয়েই থাকতেন। মহাপ্রভু ছিলেন আমার রক্তের। সেই রক্তের ধারা, সেই বেদের ধারা ধরে ধরে তিনি বেদ প্রচার করতেন। আমিও সেই বেদ প্রচার করে যাচ্ছি। এখানে আমি গুরু বা মহাপুরুষ সাজতে আসিনি। আমার তের পুরুষ আগে মহাপ্রভু বেদের যে সুর দিয়েছিলেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাইকে একসুরে আনার জন্য বেদের যে সুর প্রচার করেছিলেন, সেই সুর, সেই মত, সেই পথ সবাইকে দান করার জন্য আমি এসেছি। বেদের সেই সুর সবার কাছে তুলে ধরার জন্য আমি এসেছি। বেদমন্ত্র ..... বেদ কি বলতেন?ধর্ম কি বলতেন? প্রমাণবিহীন ভগবানের নাম কেউ যদি করে, তাকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে। কতবড় কথা।

ভগবান সম্পর্কে এমন কোন কথা কেউ বলতে পারবে না, যার কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে না বা কোন প্রত্যক্ষ অনুভব বা অনুভূতি দেখাতে পারবে না। যে ভগবান সম্পর্কে এখন আমরা কথা বলি, যে ভগবানের ওপরে আত্মসমর্পণ করে বসে অছি, সেই ভগবান আছেন কি নেই, সেটা পরবর্ত্তী কথা। আগে প্রমাণ করতে হবে। আর এখন কি হচ্ছে? এখন আমরা আগেই বলছি, ভগবানের কথা, স্বর্গমর্ত্যের কথা, দেবদেবতাদের কথা। বেদ বলছে, তোমরা দেবদেবতাদের কথা, ভগবানের কথা বলতে পার, কোন আপত্তি নাই; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের ভগবত্তার সত্তা সম্পর্কে কোন প্রমাণ না দিতে পার, কোন পরিচয় না দিতে পার, সেই কথা অগ্রিম বলতে পারবে না। তাহলে সমাজ শয়তান হয়ে যাবে, শয়তানের ভাণ্ডার হয়ে যাবে। সমাজে কতগুলি সাধুসন্ন্যাসীর বেশধারী এসে ভণ্ডামি করবে, নানা বিভ্রান্তিকর কথা বলে সমাজকে বিভ্রান্ত করবে। তারা সমাজে দলাদলি আনবে, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করবে। যদি প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা দ্বারা, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বোঝাতে না পারে, দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারে, তবে সমাজ বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে, সমাজ কল্পনামার্গে চলে যাবে। সেই কল্পনামার্গের কথা সমাজকে কখনও বোঝাতে যাবে না।

প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশ, বাতাস, জল, পবন সদাই কর্মে রত। সূর্য যেভাবে তার আলো দিচ্ছে, বাতাস যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, জল যেভাবে জলদান করছে, মাটি যেভাবে তার কাজ করে যাচ্ছে, সেইসব বিষয়বস্তু দিয়ে সমাজে সেইভাবেই আমাদের জন্ম। সেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম — এই পঞ্চভূত নিয়েই আমাদের জন্ম। আমরাও সেই জীবের সেবা, জাতির সেবা, নীতির সেবা দিয়ে সমাজের সেবা করবো। প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিতর দিয়ে সেবা করবো। এখানে কল্পনার কথা চলবে না। তাই তখনকার সময়ে ধর্মে ছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা। কল্পনার কথা উচ্চারণ করা নিষেধ ছিল। কল্পনার কথা বা এমন কোন কথা বলবে না যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে। ভগবানের কথা এমন কিছু বলবে না, যাতে মানুষ কল্পনায় চলে যেতে পারে। ভগবান থাকুক বা না থাকুক, কোন কথা নাই, দেবদেবতা থাকুক বা না থাকুক কোন ভাবনা নাই। আগে চিন্তা কর কিভাবে

সমাজের ভিত তৈরী করতে হবে। ..... বেদমন্ত্র .....। সমাজের সবাইকে চাষ করতে হবে, শ্রমদান করতে হবে, শ্রমিক হতে হবে। সমাজের অভাবের মূল কারণ যারা, তাদের বিষ দাঁত গুলো উৎপাটন করতে হবে। সেই যুগে একটা কুকুর মারা গিয়েছিল অনাহারে, বেদজ্ঞরা এজন্য সমাজের সবাইকে দায়ী করলেন। তারা বললেন, রোগে মরতে পারে, অসুস্থ হয়ে মরতে পারে, কিন্তু অনাহারে একটা কুকুর বিড়ালও মরতে পারবে না। তোমার যে অধিকার, একটা কুকুরেরও সেই অধিকার আছে এই সমাজের বুকে। সেও সূর্যের আলো, জল, বাতাস গ্রহণ করছে এই পৃথিবীর বুকে থেকে। তাই একটা কুকুর মারা যাওয়াতে বেদজ্ঞদের মধ্যে আলোড়ন, আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। চিন্তা করে দেখ, আজ সমাজ কোথায় দাঁড়িয়েছে। একটা কুকুরের মৃত্যুর কথা তোমরা শুনলে। আর আজ লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে অনাহারে। তাদের কোন আশ্রয় নাই, বস্ত্র নাই। আজ মানুষের ভিতরে কোন আন্তরিকতা নাই, ভালবাসা নাই, প্রেমপ্রীতি নাই। মানুষের ভিতরে আছে শুধু হানাহানি, মারামারি, দলাদলি আর কাটাকাটি। চারিদিকে চলছে শুধু নিন্দা, চর্চা। বুঝুক বা না বুঝুক যা খুশী তাই উক্তি করছে, সমালোচনা করছে। অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি সব নষ্ট হছে গেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় সমাজ ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে চলে গেছে। কোনদিক থেকে কোন সাহায্য নাই, সহযোগিতা নাই, যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। আজকে যদি বেদের যুগের মানুষেরা থাকতো, আমাদের পুড়িয়ে মারতো। বলতো, সমাজকে এরা নিঃশেষ করেছে, এরা মানুষের জাত নয়। আজকের সমাজ আর বেদের যুগের সমাজে কি বিরাট পার্থক্য।

আজও আমাদের মধ্যে সেই রক্ত রয়েছে, সেই বেদের সুর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নাই শুধু আমরাই। আমরা আজ সেই সত্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। সেই বেদের যুগে বেদের সুরে শিব লিখেছেন, বিষ্ণু লিখেছেন বেদেরই কথা। তখন দেবর্ষিও ছিলেন। শিব বললেন, কি বললেন? তোমরা (বেদজ্ঞরা) দ্বারে দ্বারে বেদ প্রচার কর। বেদ প্রচারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি আনয়নের ব্যবস্থা কর। সমাজে যাতে একজনও অনাহারে না থাকে, সেদিকে নজর রাখ। শুধু ৫নং, ৬নং বাড়ী নয়, সমস্ত জগৎটা যাতে একান্নভুক্ত

পরিবার হয়ে যায়, তার চেষ্টা কর। সবার সুখে সুখী, দুঃখে দুখী হও। সকলের মাঝে এরকম মনোভাব তৈরী করার লক্ষ্যে অগ্রসর হও। এখন একজনকে মেরে অন্যজন দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। একদলকে দাবিয়ে অন্যদল, এক সম্প্রদায়কে নিঃশেষ করে অন্য সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। এক ব্যবসায়ীকে শেষ করে অন্য ব্যবসায়ী ব্যবসা বাড়াতে চাইছে। এই রাগ, দ্বেষ, হিংসা, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কি রাজনীতি, কি ধর্মনীতি — উভয় দিক থেকে উঠছে শুধু কোলাহল আর সাম্প্রদায়িকতার হলাহল। এগুলি আগে বন্ধ কর। এগুলি যেন অঙ্কুর না গজাতে পারে, ট্যাম না গজাতে পারে, আগাছা না গজাতে পারে। তাই তোমরা দ্বারে দ্বারে বেদের নাম, বেদের তত্ত্ব প্রচার কর। শিব এবং বিষ্ণু নিজ হাতে ইহাই লিখলেন। বেদমন্ত্র ..... হে ঋষিগণ তোমরা কাজ কর। সমাজে সকলের মাঝে থাকবে সমান সুর, সমান আসন। একটি একান্নভুক্ত পরিবারের মত সমাজ তৈরী কর। সমাজে ধনী গোষ্ঠী, শোষক গোষ্ঠী, মজুত গোষ্ঠী থাকবে না। এটাই আগে বলবৎ কর। এটাই আগে প্রতিষ্ঠা কর। তাঁরা ত্রিশূল পুঁতে দিলেন। সমাজে সবারই থাকবে এক আসন, সম মর্যাদা। এখানে কোন আশ্রম থাকবে না। সমস্ত পৃথিবীটাই হল আশ্রম, দেশটাই হল আশ্রম। এই আশ্রমের বুকে সবাই সন্ন্যাসী। বেদমন্ত্র ..... বেদ বলেছেন শুধু গেরুয়া পরলাম, মালা পরলাম, মস্তক মুণ্ডল করলাম - তাহলে চলবে না। এই সন্ন্যাসী হতে হলে কোন বেশ ধারণের প্রয়োজন নেই। কারণ জন্মই সন্ন্যাস। মৃত্যুই শ্মশান, মৃত্যুই ত্যাগ। সুতরাং বেদ বলেছেন, আমরা ত্যাগী হয়েই জন্মেছি। আমরা প্রত্যেকেই সন্ন্যাসী।

শিব এবং বিষ্ণু বললেন, তোমরা ত্যাগী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছো। মৃত্যু যখন আছে, ত্যাগ তো অনিবার্য। দেহ পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে। তাই আলাদা সন্ন্যাস গ্রহণের চিন্তা করার কোন প্রয়োজন হবে না। বেদজ্ঞদের বললেন, তোমরা এইভাবে জনমানসকে তৈরী কর। কেউ যেন একদিনের খোরাকও মজুত না করে, সঞ্চয় না করে। একজন যেন অপরজনের উপরে আধিপত্য না করে। সমান দৃষ্টি, সমান সুর থেকে কেউ যেন বিচ্যুত না হয়। যে যাই কাজ করুক, সকলের থাকবে সমান আসন, সম-মর্যাদা।

ঝাড়ুদার থেকে লেখক অবধি সবার সমান সুর। একজন ঝাড়ুদার তার যে দাবী, একজন লেখক যে কলম চালায়, তারও সেই সমান দাবী, সমান অধিকার। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনেও কোন বাধা ছিল না। সম্বন্ধ করতে গিয়ে ছেলের বাবা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমার বাবা কি করেন?' মেয়ে উত্তর দিচ্ছে, 'আমার বাবা ঝাড়ুদার।' একথা বলতে তারা গৌরববোধ করতো। আবার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমার বাবা কি করেন?' ছেলে বলছে, 'আমার বাবা লেখক।' দুজনে একই মাপ, একই পর্যায়, একই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর মাঝে কেউ কোন বৈষম্য করতে পারবে না, তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। যদি কেউ করে, সেখানে নানারকমভাবে শাসন করা হতো। ঝাড়ুদারের পাশে লেখক বসতে কোন কুণ্ঠাবোধ করতো না। কারণ আগেই বলা হয়েছে, সকলের ছিল একই আসন।

বিরাট খাদ্যের ভাণ্ডার পড়ে থাকতো। সকলের জন্যই খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। যার যেটুকু প্রয়োজন, সে সেটুকু গ্রহণ করবে। সেখানে আমার বলে কোন কথা নেই। সবার জমি, সবার অধিকার। সেই ভাবেই তারা চাষবাস করতো এবং এক জায়গায় সব খাদ্য মজুত রাখতো। কেউ যদি মনে করতো, কালকের খাবারটা নিয়ে যাই, তার হাত কেটে ফেলে দেওয়া হতো। কেউ যদি মজুত করার বুদ্ধি করতো, তাহলে বুঝতো সমাজে বিষ ঢুকতে আরম্ভ করেছে। মজুত আছে বলেই, সঞ্চয় আছে বলেই সমাজে আজ এই অভাব। বেদমন্ত্র .....।

শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বাণ ধারণ করেছিলেন কেন? রাক্ষস রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন কেন? এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি? সীতা হচ্ছে ভূমি, বসুমতী। রাবণ বসুমতীকে দখল করতে এসেছিল। রাবণ শয়তান। শ্রীরামচন্দ্র রাবণের হাত থেকে বসুমতীকে রক্ষা করলেন। আজ আমাদের বাংলা, ভারত, পৃথিবীর বুকে যারা এইরকম রাক্ষস, এইরকম শয়তান, যারা আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের শিয়রের সুখ, শিয়রের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে, আমাদের বস্ত্রহারা, সর্বহারা করে দিচ্ছে, তারাই হল অসুর। এই অসুরদের দমন করবার জন্য দেবতারা এলেন। মা দুর্গা তাঁর

সমস্ত সিংহবাহিনী নিয়ে এলেন সমাজের বুকে।

আজ আমরা মায়ের পূজা করছি। শুধু আবাহন আর বিসর্জনেই পূজার সমাপ্তি। তার সাথে আছে 'দুর্গা মাইকি জয়।' শুধু এই হলে চলবে না। বেদ বলেছেন, মা দুর্গা আছে কি নেই, সে বিষয়ে কিছু বলছি না। বেদ যা বলেছেন, তার বাইরে কিছু বলা চলবে না। মানচিত্র দেশ নয়। মানচিত্র দেয়ালে ঝোলানো থাকে। মানচিত্র দেখে, মানচিত্র পাঠ করে দেশভ্রমণ হয় না। **মাটির বুক থেকে মাটি নিয়ে যে মূর্তি তৈরী করা হয়, সেই মূর্তি হচ্ছে এমন একটি মানচিত্র, যেই মানচিত্রকে অনুসরণ করে আমরা গড়ে উঠতে পারবো, সমস্ত দেশকে গড়ে তুলতে পারবো। সমস্ত দেশকে কিভাবে অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, সমস্ত দেশকে কিভাবে জয় করা যায়, তারজন্য বেদজ্ঞরা দ্বারে দ্বারে দুর্গা পূজার ব্যবস্থা করলেন। বেদজ্ঞরা বললেন, তোমরা এই মানচিত্রের স্মরণ কর। এই মানচিত্র হচ্ছেন দেশজননী পার্বতী, মা দুর্গা। তিনি দশহাতে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। একহাতে ত্রিশূল, একহাতে চক্র, আরেকহাতে স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা। তিনি দশহাতে দশপ্রহরণধারিণী। তিনি সিংহের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। মা আসছেন শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী তাঁর সন্তানদের নিয়ে।** বেদজ্ঞরা একটি গল্প বলতে লাগলেন। মায়ের সন্তানদের কারও হাতে ধনুর্বাণ, অস্ত্রশস্ত্র, তারা যেন অসুর নিপাত করতে আসছেন। মেয়ে এভাবে বাপের বাড়ী আসবে কেন? তাঁর এই রণসজ্জা কেন? কারণ তিনি চান তাঁর বাপের বাড়ী অসুরমুক্ত হোক; তাঁর বাপের বাড়ীর দেশ থেকে অভাব দূর হোক। মা চান তাঁর ভাইবোনেরা, সন্তানরা শোষণমুক্ত হোক, একটু সুখে, একটু শান্তিতে থাকুক। যাবার সময় তিনি আমাদের দিয়ে গেলেন 'এই নাও ত্রিশূল, এই নাও খড়্গ, এই নাও সিংহ।' তোমরা তৈরী হও। অসুর কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ছোবল দিয়ে যাচ্ছে; তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে যদি এতটুকু গাফিলতি কর, তোমরা শেষ হয়ে যাবে। — এই পূজার কথাই বেদজ্ঞরা বলেছেন। তারপরই অমাবস্যা তিথিতে নিয়ে এল আরেকটি মানচিত্র, আরেকটি মাতৃমূর্তি; — তিনি মা কালী, তিনি উলঙ্গ। সৃষ্টি যখন হয়, উলঙ্গ হয়েই হয়। সৃষ্টি,

স্থিতিকে রক্ষা করার জন্য মা উলঙ্গ হয়ে, নগ্ন হয়েই এসেছেন। তিনি শবারূঢ়া, হাস্যযুক্তা, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা ..... তিনি অসুরের রক্তপান করছেন। তিনি ফুলের মালা গলায় দেননি। তিনি এই সমস্ত অসুরের, ব্যবসায়ীদের তথা দানবদের, যারা সমাজকে নিঃশেষ, করছে, তাদের মুণ্ড গলায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মা তোমাদের ফাঁকি দেননি। তিনি একহাতে মুণ্ডমালা, অসুরের মুণ্ড ধারণ করে আছেন। অপর হাতে আশীর্বাদ করে সন্তানদের বলছেন, তোমরা যদি আমার সন্তান, আমার বাচ্চা হয়ে থাকো, সেইভাবে যদি না চলো, আমার প্রকৃত পূজা যদি না কর, তাহলে তোমরা কুকুরের চেয়েও অধম। আমি কি চাই, সেটা বুঝে নিয়ে আমার পূজা কর। সেইভাবে খড়্গ নাও, ত্রিশূল নাও, আমার সবকিছু নিয়ে সমাজকে রক্ষা কর। সমাজ আজ দুর্দশাগ্রস্ত। সমাজের খাওয়া নাই, পরা নাই, কিছু নাই। শিশুরা মায়েরা না খেয়ে মরছে। আরেকদল ভাল ভাল জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবতেও ঘৃণা করে, লজ্জা করে। এ দৃশ্য দেখেও তাদের হুঁশ হয় না, লজ্জা হয় না? ৫/৬ দিন আগে একটা বিয়েবাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম ১০/১২ বছরের কয়েকটি ছেলে ফেলে দেওয়া পাতাগুলো চাটছে; পাশে কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে আছে — কখন ছেলেগুলো যাবে আর ওরা ভাগ বসাবে। এটা দেখে আমি গাড়ী থামিয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলাম ওদের কাছে; বললাম, আমরা অপরাধ করেছি তোদের কাছে। আমরা নপুংসক, আমরা ক্লীব, আমরা অক্ষম। কারণ আমরা প্রতিকার করতে পারছি না। সমাজের বুকে এত লোক, এতসব সন্তান, এত এতজন আছে, একটা করে লাঠির বাড়ি, একটা কিল, একটা চড় দিলে শয়তানদের ওপরে কবর দিয়ে দেওয়া যায়। কোথায়? কোথায় আপনারা তার প্রতিকার করেছেন? আপনারা দলাদলি করছেন, রেষারেষি করছেন। রাজনীতি, ধর্মনীতির দলাদলি আর রেষারেষি করে আমার দেশকে, আমার ভাইবোনদের ডোবাবার অধিকার আপনাদের নাই। এটা কারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। এটা জাতির সম্পত্তি। জাতির সম্পত্তি নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলবে, তাদের আমরা শেষ করবো, করবো শেষ। আজকে **আমরা সেইপথের পথিক হয়ে আসছি, আমরা সৈনিক হয়ে আসছি, আমরা সন্তানদল তৈরী করছি। বেদের সুর নিয়ে, ত্রিশূল হাতে নিয়ে আসছি। শিবকে বলেছি, হে শিব, হে ভোলানাথ,**

হে মহাদেব—এখন তোমার ত্রিশূল আমাদের হাতে দাও। তুমি চুপ করে বসে থাক। মাকে বলেছি, তোমার খড়্গ আমাদের হাতে দিয়ে দাও। শেষ যুদ্ধ, শেষ লড়াই করবো।

আমরা গদীর লড়াই করবো না, রাজনীতির লড়াই করবো না। আমরা সমগ্র জাতির জন্য লড়াই করবো, আমরা খাওয়ার লড়াই, শিক্ষার লড়াই করবো। আমরা তৈরী হওয়ার লড়াই করবো। আমরা কারও বিরুদ্ধে লড়াই করবো না। গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না। আমাদের লড়াই, শয়তানের বিরুদ্ধে। কতগুলো শয়তান চিনতে পেরেছি। সেই শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। তাই আপনাদের কাছে এটাই বলছি যে, বেদের যুগে বেদজ্ঞরা এইভাবে বেদের প্রচার করতেন। আগেই বলেছি, সেইসময়ে খাওয়া পরার অভাব ছিল না। স্থানের অভাব নাই, বস্ত্রের অভাব নাই, সমান সুরে সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল। এক মহা আনন্দের ঢেউ অবিরাম বয়ে যাচ্ছিল সেই সমাজের বুকে। তখনকার সময়ে মিথ্যা কথা যে আছে, জানতো না কেউ। অভিধান খুঁজে দেখে 'মিথ্যা কথা' লিখেছে বলে তাকে পাহাড় থেকে ফেলে মেরে ফেলে দিল। মিথ্যা আবার কি? যা সত্য যা ন্যায়, সেই পথে তারা চলতো। অন্যায়, অবিচার যে যা কিছু করতো, সব বলে দিত। তাই 'মিথ্যা' বলে কোন কিছুই তাদের মাঝে ছিল না। আজকের সমাজে সত্য কথাটি আছে কিনা সন্দেহ। চারিদিকে সব মিথ্যায় ভরে গেছে।

যাক্ সেই যুগে যখন আর অভাব রইল না, চারিদিকে বয়ে গেল অপার আনন্দের ঢেউ, তখন কি হল জানেন? একশ্রেণীর ব্যক্তিরা সমাজের বুকে আধিপত্য করার জন্য, আধিপত্যের লড়াই করার জন্য এগিয়ে আসলেন। তারা দেখলেন মহামুস্কিল। বেদ ছাড়া কেউ চলে না। তাই ঠিক করলেন, বেদকে রেখেই বেত মারতে হবে। তারাই সৃষ্টি করলেন দল, তারাই সৃষ্টি করলেন সম্প্রদায়। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী অসুর বললেও আপত্তি নেই, তাদের মধ্যে ছিল বড় বড় পণ্ডিত। তারা ঠিক করলেন, বেদকে সামনে রেখে বেদের বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাব। তাদের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। পেট-পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে। তারা দেখলেন, স্বাস্থ্য ভাল হওয়া

দরকার। কি করা যায়? তারা জটা রাখতে আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে বাবাজী, ব্রহ্মচারী বনে গেলেন, সাধু, অবতার সেজে গেলেন। অনেকে গুরু, মহান সেজে গেলেন, পূর্ণ অবতার সেজে গেলেন। গুরু মহানের ছড়াছড়ি হয়ে গেল। বড় বড় পণ্ডিতেরা মীটিং করে ঠিক করলেন, তোমরা সাধু, গুরুর অভিনয় কর, আমরা ব্যবসায়ীর নাটক করি। দুই দলের মধ্যে সাঁট চলছে, দুই দলই জনগণের গলা কাটতে নেমে পড়লেন। নিজেদের নিলামের মাল যেমন নিজেরাই বিক্রী করে, ঠিক তেমনি। কেউ কৌপীন পরলেন, কেউ উলঙ্গ হলেন। বেদমন্ত্র ..... তারা জনগণকে শোষণ করার আরও উপায় বের করলেন। বলতে লাগলেন, পিত্তর আত্মার কল্যাণে, মৃত আত্মীয় স্বজনদের আত্মার কল্যাণে যদি তোমরা কিছু না কর, তবে তারা অসুর হয়ে যাবে। তাই আত্মার কল্যাণ তোমাদের করতে হবে, বিদেহী আত্মার কল্যাণে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করা হল। আত্মার কল্যাণে শ্রাদ্ধের যাবতীয় জিনিসপত্র টেম্পো ভরে নিয়ে গেল। আর বলে গেল, তোমাদের বাবার আত্মার কল্যাণ হয়ে গেল, মুক্তি হয়ে গেল। চারিদিকে একটা শিহরণ পড়ে গেল, 'আমার তো বাবা মারা গেছে, আমার ভাই মারা গেছে' — সত্যিই যদি তাদের আত্মার মুক্তি না হয়, তারা যদি বায়বীয় জগতে ঘুরতে থাকে, তাহলে কি হবে? বেশীরভাগ মানুষের মাঝেই যেন একটা হিড়িক পড়ে গেল। আবার সাধুদের চেলা চামুণ্ডারা মাঝে মাঝে সেজে সেজে ঢং ঢাং করে বলতে লাগলো, 'আমাদের মুক্তির জন্য কিছু করলি না, আমার জন্য কিছু কর।' জনগণ শ্রাদ্ধ শান্তির দিকে আরও ঝুঁকে পড়লো।

এদিকে সাধুরা নানারকম কাণ্ডকীর্তি করতে আরম্ভ করলো। কেউ বাতাসা খাওয়ায়, কেউ ফাঁকা থেকে সন্দেশ খাওয়ায় — এমনভাবে তারা দেখাতে লাগলো যে, অনেকে তাদের দলে ভিড়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, 'কিরে কেমন ব্যবসা ফেঁদেছি? চারিদিকেই তো ব্যবসা। কোন সাধু বলছে, তোর শনির দশা। আরেকজন বলছে, তোর রাহুর দশা, কেতুর দশা। চারিদিকে শ্রাদ্ধশান্তি, যাগযজ্ঞের ধূম পড়ে গেল। শয়তান কিন্তু সাধু হল। শয়তানের রাজত্ব চলতে লাগল। তারা এমনভাবে

জটা রাখতে শুরু করলো যে, শয়তান জট পাকাতে শুরু করলো। সবটার মধ্যেই জট। এদিক দিয়ে জট, ওদিকেও জট। মঠ, মন্দির গজিয়ে উঠলো। শঙ্খ, ঘন্টা ধ্বনি শুনতে খারাপ নয়, দেখতে তো ভালই। বেদ তো বলেনি, পূজা-অর্চনা করো না। বেদ বলেছে, কি আছে, কি নেই প্রমাণের মাধ্যমে জেনে করতে হবে। আত্মা আছে কি নেই — প্রমাণের মাধ্যমে সব জানতে হবে। প্রমাণবিহীন কোন কথা বলা চলবে না। বেদ বলছে, গ্রহণ কর আপত্তি নেই, তবে না জেনে, না বুঝে নয়। আগে জানবে, বুঝবে, তবেই তার তত্ত্ব গ্রহণ করবে। আত্মা আছে কি নেই, ভগবান আছে কি নেই, শুধু মুখের কথায় মেনে নেবে? তারজন্য আজকের ধর্ম, একটা জাতির ধর্ম, সেটা সমস্ত জাতিতে গ্রহণ করতে পারছে না। ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং ..... বলে যে সূর্যকে প্রণাম করছি, সেই সূর্যকে তো সবাই গ্রহণ করছে। কারণ সূর্য সবার, বাতাস সবার। সূর্যকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান — সবাই মেনে নিচ্ছে। এক চন্দ্রকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সবাই গ্রহণ করছে। আমাদের চন্দ্রকে মুসলমান পুজো করছে। আমরা তো তাতে আপত্তি করছি না। মুসলমানদের এক ধর্ম, এক জাতি, এক নীতি। আমাদের মধ্যে সেটাও নাই। আমাদের মধ্যে সেটাও ঘুচে গেছে। বেদ বলেছে, প্রকৃতির ধর্ম জীব ধর্ম, এক জাতি, এক নীতি। কিন্তু ওরা দেশগত, জাতিগত, ভাষাগত — সব রেখা টেনে টেনে ভাগ করছে। ভাগটা করলি কি করে? পৃথিবী কখনও ভাগ হয়? রেখা টেনে টেনে ভাগ। ধর্ম কখনও ভাগ হয়? কাগজে কলমে ভাগ হয়। মুখে মুখে যা ভাগ হয়, সেটা কি বিজ্ঞানসম্মত? হিন্দু, মুসলমান, কেটে গেলে দেখা যাবে সবারই রক্ত লাল। মুখে মুখে ভাগ হয়েছে এখানকার ভাষা, এখানকার নীতি, এখানকার দেশ, এখানকার সমাজ, এখানকার সবকিছু। সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধুগুরু বেশধারী শয়তানেরা একেবারে সব ভাগাভাগি শুরু করে দিলো। তারা প্রচার করতে লাগলো, তাদের কাছে দেবতারা আসেন। শিব এসে যেন কথা বলে যান। মা কালী, মা দুর্গারা সব কথা বলে চলে যান। আমরা যেমন কড়া নাড়ি, মা কালী এসে কড়া নাড়েন,— দরজা খোল। এই সব ভেকধারী শয়তানেরা সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ ভরে পড়ে, দশায় পড়ে বলে — মা মা। বলে, মা এই আমার মধ্যে আসছে।

এগুলো একটাও বিজ্ঞানসম্মত নয়, গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সত্য যেটা হবে, প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। সত্য কখনও কল্পনা হয় না, সত্য কখনও ধারণায় হয় না। ধারণায়, কল্পনায় এই সমস্ত সৃষ্টি করে করে সত্যকে দাবিয়ে রেখেছে এবং তারাই আজকের সাধু, গুরু মহানে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার ৬০/৭০ লক্ষ শিষ্য। এরমধ্যে একজন অর্থবান শিষ্যকে বেছে নিয়ে যদি বলি, 'তোর শনির দশা।' সে এসে বলবে, 'বাবা, উপায়?' এইবার দেখ, তোরে কেমন খসাই? আমি যদি বলি, 'তোর বাবা ব্রহ্মদৈত্য হয়ে আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোকে এর প্রতিবিধান করতে হবে।' সে বলবে, 'বাবা, তুমি যা বলবে।' এরপরে বলতে হবে, 'তোকে আধপো সোনা দিয়ে শিব গড়াতে হবে। এই দুর্মূল্যের বাজারে সবই দুর্মূল্য। তোকে কম কম করে বলছি।' ছাতি, লাঠি, আধমণ ঘি, চন্দনকাঠ সব সে এনে দিল। এইবার যজ্ঞ করা শুরু করলাম। পূর্বপুরুষদের তর্পণ করলাম। তারপর যজ্ঞের ঘি দিয়ে, ছাই দিয়ে মিশিয়ে কপালে ফোঁটা দিয়ে বললাম, 'যা ব্যাটা বাড়ী যা। তোর কাম (কাজ) হয়ে গেছে।' এইবার বললাম, 'ডাক দেরে, টেম্পো ডাক দে। টেম্পো ডাক দে। টেম্পোতে মনে হয় হবে না। লরি ডেকে আন'।এইভাবে যদি গুরুগিরি করে রোজগার করতাম, তাহলে প্রতিদিন ২০ হাজার টাকা হয়ে যেত। ৬০/৭০ লক্ষ শিষ্য, বুঝলেন না? আজকে বলবো, এর শনির দশা; কালকে ওর রাহুর দশা। এরকম করে বললেই হল। একটাকে ধরেই আরেকটাকে ধরবো, কোন অসুবিধা নেই। এইভাবে আমার নিরীহ শিষ্যদের ওপর যদি অত্যাচার, অবিচার করতে শুরু করি, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন যাগযজ্ঞ করতে শুরু করি, তবে সেটা হবে সবচেয়ে বড় বেদবিরোধী কাজ। বেদ বলেছেন, এগুলো সব ব্যবসার ফাঁদ। আপনাদের বলছি, দয়া করে বেদের কথা যদি অনুসরণ করেন, শিবের কথা যদি মেনে চলেন, তবে এইসব ফাঁদে পা দেবেন না। যজ্ঞ হচ্ছে নিজের আত্মার জন্য, **যজ্ঞ হচ্ছে নিজস্ব সত্তার জন্য; কোন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে অপরের কল্যাণের জন্য নয়। শনি, রাহু, কেতুর**

যজ্ঞ হচ্ছে নিজের আত্মার জন্য, যজ্ঞ হচ্ছে নিজস্ব সত্তার জন্য; কোন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে অপরের কল্যাণের জন্য নয়। শনি, রাহু, কেতুর কথা যদি কোনদিন কেউ বলে, তার তিনহাত দূর দিয়ে চলবেন। ঐ সমস্ত দুর্বলতার ফাঁদে কোনদিন পড়বেন না। আগেই বলেছি, এগুলো অত্যন্ত বেদবিরোধী কাজ।

এই অপরাধ সমাজের বুকে হয়ে চলেছে, এর বিহিত যদি সমাজ না করে, তবে এই খুনের জন্য দায়ী সমাজ।

কথা যদি কোনদিন কেউ বলে, তার তিনহাত দূর দিয়ে চলবেন। ঐ সমস্ত দুর্বলতার ফাঁদে কোনদিন পড়বেন না। আগেই বলেছি, এগুলো অত্যন্ত বেদবিরোধী কাজ। আমি তো এই লাইনেই আছি। গুরুগিরি করে এতদিনে চৌরঙ্গীতে আট, দশটা বাড়ী করে ফেলতে পারতাম। এইভাবে মানুষকে ঠকানোর চেয়ে আমি গাঁটকাটাকে সম্মান দেব। আমি আমার শিষ্যদের বলেছি, যেদিন দেখবে, পূজা-পার্বন, হোম, যাগযজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মাধ্যমে আমি অর্থোপার্জন করতে শুরু করেছি, সেদিন আমাকে গুলি করে মেরে ফেলে দেবে। ঐ ভণ্ডামিতে আমাকে স্থান করতে দেবে না। এগুলো যে করবে, তাকেই পানিশমেন্ট দেবে। সমাজের বুকে এসবের স্থান দেওয়া চলবে না। যাগযজ্ঞ হোম—এগুলো হচ্ছে নিজস্ব কাজ। বেদ যজ্ঞ করতে বলেছে কেন? কেন হোম করতে বলেছে? কেন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে বলেছে? তার যুক্তি রয়েছে, প্রমাণ রয়েছে, বিজ্ঞানসম্মত অর্থ রয়েছে। সেই প্রমাণগুলো না শুনে, প্রমাণগুলো ব্যবহার না করে ঐ সমস্ত শয়তানের গোষ্ঠী আজকে আমাদের কাছে আসছে। আর তাদের অনুসরণকারীরা সাধু, গুরু, ব্রহ্মচারী সেজে সমাজের বুকে দলাদলি করে, সাম্প্রদায়িকতা করে মানুষের গলা কেটে কেটে আশ্রম, মঠ, মন্দির তৈরী করছে আর দেখাচ্ছে যেন অবতারের বাবা, অবতারের ঠাকুরদাদা। এখানে এই ধরণের সাধু, গুরু সাজতে আমি লজ্জাবোধ করি। প্রকৃত সাধু, গুরু যিনি তাঁর মধ্যে থাকবে সততা, তাঁর মধ্যে থাকবে বেদের সত্য, তাঁর মধ্যে থাকবে অকাট্য যুক্তি। কারও কোন কথার ওপরে তিনি প্রভাবিত হবেন না, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন না। অন্যায় যদি আমি বুঝি, আমি সেটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে যাব। অন্যায়ের প্রতিকার করার অধিকার সবারই আছে। আমি সেইভাবে সমাজের বুকে সমতার সুরে বেদ প্রচার করে দিয়ে যাই। মানুষ যেন বেদের শাসনে থাকে, তারা যেন বেদের সুরে চালিত হয়। যেভাবে মানুষ মার খাচ্ছে দিনের পর দিন, অসুররা এমনভাবে সাধারণ মানুষকে নিষ্পোষিত করছে, এটা দেখে বেদ বলেছেন, **এই যে অপরাধ সমাজের বুকে হয়ে চলেছে, এর বিহিত যদি সমাজ না করে, তবে এই খুনের জন্য দায়ী সমাজ। আর আমরা দায়ী করি সরকারকে। সরকারকে**

দায়ী করলে চলবে না। এরজন্য দায়ী আমরা নিজেরা। আমরা দায়ী করবো সমাজকে। সমাজকে দায়ী করে আমরা সেইভাবে সংগঠন তৈরী করবো। আমরা নিজেরা যদি বিহিত করতে না পারি, অন্যকে গালি দিয়ে আমাদের লাভ কি? আমাদের বিহিত আমাদের করতে হবে। তাই আপনাদের কাছে আমি শিবের বাণী, বিষ্ণুর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। স্বয়ম্ভূ গায়ত্রী নিজহস্তে লিখেছেন ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্। একটি লোকও অনাহারে থাকবে না। তোমার বাচ্চা, তোমার সবকিছু সমানভাবে পাবে। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের লড়াই যাতে না বাধে তার ব্যবস্থা কর। সমাজের বুকে ক্ষত সৃষ্টিকারী ঐ যে মজুতদার, ঐ ধনিকগোষ্ঠী, ঐ শোষক, ঐ ভুঁড়িওয়ালা — তাদের খতম কর। বেদ বলেছেন, কেউ যদি সঞ্চয় করে ২০ লক্ষ টাকার মাল কিনে মজুত রাখে, তবে সে অনেককে বঞ্চিত করার পথ তৈরি করলো।

পার্বতী কেন ত্রিশূল নিলেন? কেন তাঁরা লড়াই করতে এলেন? কেন অসুর দমন করতে এলেন? দেবদেবতারা কোথায় কাজ করবে ভাল; তা না করে তাঁরা এখানে এসে মারামারি, কাটাকাটি করতে আরম্ভ করলেন? এ কি অন্যায়? তোমার ভিতরেই তো চলছে ন্যায়-অন্যায়ের খেলা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেবতা সচেতন রয়েছে তোমার মধ্যে। আবার তোমার মধ্যেই যে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে। একজন বিবেক রয়েছে, আরেকজন অবিবেক রয়েছে। অবিবেক, সে কেবল খোঁচাখুঁচি করতে চায়। বিবেক বলছে, তুমি যদি ঠিক না হও, সচেতন না হও, তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো। নিজের ভিতরে বুদ্ধি যে অবিচার করছে, তাকে বিবেক নিজে বলছে। তাই তোমার মধ্যেই তুমি সবসময় যুদ্ধ কর। সেই যুদ্ধে সেই অবিবেকরূপী শয়তানকে বিনাশ কর। শয়তান চারিদিকে তোমাকে বুদ্ধি দিচ্ছে। আর প্রকৃতি প্রদত্ত যে বিবেক, যে সচেতন সে কখনও তোমাকে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে না। সে তোমাকে সবসময় সচেতন করে দিচ্ছে; সবসময় জানিয়ে দিচ্ছে, এই কাজটা তোমার করা ঠিক হয় নাই, এই কাজটা করা অন্যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে

তোমার ভিতরেই তো চলছে ন্যায়-অন্যায়ের খেলা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেবতা সচেতন রয়েছে তোমার মধ্যে। আবার তোমার মধ্যেই যে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে।

সে সবসময় তার প্রতিবাদ জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিবেকের নির্দেশে তার কথাতে, তার সচেতনে তুমি চলবে। এটাই বেদ বলেছেন। তাই আমাদের নিজেদের শাসন করার কথাই হলো ধর্মের কথা। ধর্মের কথায় এটাই হল প্রধান কথা। এটাই হল ধর্মের ধারাপাতা। একটা শিশুকে প্রথমেই বড় বই দিলে সে চাপা পড়ে যাবে। সুতরাং বইয়ের আগে তাকে ধারাপাতা ধরে ধরে শেখাতে হবে। প্রথমে অ আ শিখে নিলে তার পরে তো ক খ। তারপরে তো ক-এ কলম, খ-এ খড়ম, গ-এ গণ্ডার শিখে নেবে। তারপরে তো শিখবে আস্তে আস্তে করে।

এখন কথা হ'ল তার পরবর্ত্তী কথা কি? ধর্মের ধারাপাতা ধরে ধরে এগিয়ে গিয়ে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা কি জানবো? ভগবান আছেন কি নেই, কেন এই সৃষ্টি? এই সৃষ্টির রহস্য কোথায়? কোথায় তার সাড়া? কোথায় তার সুর? কেন এই অনন্ত গ্রহনক্ষত্র? কি তার কর্মধারা? সৃষ্টির মূলকারণ কি? কি তার মূলতত্ত্ব, মূলবার্তা? জানার পথে জানতে জানতে আস্তে আস্তে step by step ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমরা এগিয়ে যাব কর্মধারার পথে ধারাবাহিক ভাবে। সেই ধারাবাহিকতার ধারা ধরে ধরে আমরা যখন এগিয়ে যাব, আপনিই বুঝতে পারবো আমাদের মর্ম। আমাদের ভিতটা তৈরী করে নিতে হবে। ভিতটা যদি কাঁচা থাকে, তাহলেই শয়তানি শুরু করবো। মানুষ শয়তান হয় কেন? তার ভিতটা কাঁচা থাকে বলে। আজকে চারিদিকে শিষ্যের থেকে গুরু বেশী কেন? বাংলা ভারতে যত সাধু, রাশিয়াতে এত সাধু আছে? সকল ভগবান কি এক জায়গায় ঠাঁই পেয়েছে নাকি? **একটা কুম্ভমেলায়, পার্বণে মনে হয় যাত্রীর চাইতে সাধুর সংখ্যা বেশী। বিলাত, আমেরিকা সেই জায়গায় তো একটা সাধু নাই। সব সাধু কি একজায়গায় এসে মরেছে নাকি? একি কখনো হতে পারে? এটা কি বিজ্ঞানের কথা, যুক্তির কথা? তোমরা তো অনেকে কুম্ভমেলায় যাও। শুনলাম, সেখানে ৮ লক্ষ সাধু স্নান করছে। ৮ লক্ষ সাধু? হায় হায়। স্নান করবে তীর্থ যাত্রীরা। সেখানে সাধু বাবারা এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নেংটা। এই অবস্থা**

আজকে চারিদিকে শিষ্যের থেকে গুরু বেশী কেন? বাংলা ভারতে যত সাধু, রাশিয়াতে এত সাধু আছে? সকল ভগবান কি এক জায়গায় ঠাঁই পেয়েছে নাকি?

যেখানে, বুঝতে হবে আমাদের দেশটা কোথায় নেমে গেছে। বেদ সেখানেই কষাঘাত করেছেন, বেদজ্ঞরা সেখানেই সচেতন করেছেন। বেদজ্ঞরা বলেছেন, তোমরা এইসব ভেল্কিবাজিতে ভুলবে না; নানারকম কারসাজিতে কান দেবে না। তোমরা সঠিকতায় কঠিন হয়ে যেও। এই সমস্ত সাধুগুরুরা আশ্রম, মঠ, মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে চাঁদা কালেক্শন্ করছে, জায়গায় জায়গায় হোম, যাগযজ্ঞের নামে নিরীহ মানুষগুলিকে ভয় দেখাচ্ছে, ওগুলো তোমাদের দরকার নাই। তাদের ভগবান নিয়ে তারা থাকুক। আমাদের ভগবান আমরা বুঝবো। কিভাবে ভগবানকে পেতে হয় বা ভগবানের কাছে যেতে হয়, পরে চিন্তা করবো। আমরা কাজ করবো সমাজের।

সূর্য আপনমনে সকাল থেকে সারাদিন তার আলো দান করে যাচ্ছে; বাতাস, পবন তার বায়ু দান করে যাচ্ছে। এই যে কর্মব্যস্ততায় তারা রত, এই কর্মব্যস্ততার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদের বস্তু দিয়ে আমরা যখন তৈরি, আমরা সেইভাবেই আমাদের কর্মব্যস্ততার ভিতর দিয়ে আমাদের কর্মধারার পথ বেছে নেব। তারপর আমরা খুঁজতে খুঁজতে যাব, সূর্য কোথা থেকে এল, চাঁদ কোথা থেকে এল, গ্রহনক্ষত্র কোথা থেকে এল? কি তাদের সম্পর্ক? কিভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায়? তারপর পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমরা অগ্রসর হবো। যাগযজ্ঞের অর্থ না বুঝে তার মাঝে না গিয়ে এইভাবে যদি আমরা তার মূল কারণ, মূল ব্যাখ্যা জানতে পারি, তবে সেইভাবে নিজেদের তৈরী করে নিতে পারবো। বেদ বলেছেন, এইভাবে তোমরা তৈরী হয়ে সমাজকে তৈরী কর। **বেদজ্ঞরা যখন দেখলেন, শয়তান অসুররা সমাজকে দখল করে ফেলছে, আক্রমণ করছে, তখন তারা আবার শিবের হাতের ত্রিশূল, লাঠি-ঠেঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এবার তারা সমানে মারপিট করতে আরম্ভ করলেন।** একেবারে খণ্ডবিখণ্ড করে অসুরকুলকে বিনাশ করলেন। শয়তানদের একেবারে শেষ করে দিলেন। ধীরে ধীরে তারা সমাজকে ঠাণ্ডা করলেন। সমাজে সাম্যের সুর প্রতিষ্ঠা করলেন। অভাব দূর করলেন। আবার বেদ প্রচার শুরু হয়ে গেল। শিব নিজে বেদ প্রচার

বেদজ্ঞরা যখন দেখলেন, শয়তান অসুররা সমাজকে দখল করে ফেলছে, আক্রমণ করছে, তখন তারা আবার শিবের হাতের ত্রিশূল, লাঠি-ঠেঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এবার তারা সমানে মারপিট করতে আরম্ভ করলেন।

করলেন। **শিব এক বিরাট সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় দাঁড়িয়ে শিব নিজে বক্তৃতা দিলেন। বললেন, দেখ কে ভগবান, কে বীজ সবাই সমান। কোন গাছের ফল পেকে গেছে। কোন গাছের বীজ পড়ে গিয়ে আবার গাছ হচ্ছে। সুতরাং সবার মধ্যেই ভগবৎ সত্তা বিরাজমান। সৃষ্টিতত্ত্বে কেউ সামান্য নয়, সবাই সমান সুরে গাঁথা। কোন বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে গেছে। আবার কোন বীজ অঙ্কুরিত হবার জন্য অপেক্ষা করছে। কোন বীজ ডালায় আছে; কখন বীজটি পোঁতা হবে, সেই সময় নিচ্ছে। সুতরাং বীজ থেকে গাছ, গাছ হতেই আবার বীজ। সেইভাবেই আমরা তৈরী। শিব বললেন, তোমরা সর্বত্র সর্বাবস্থায় একই সুরে, একই সমতায় রয়েছ। কে বড়, কে ছোট সেই মাপকাঠি নির্ণয়ের কি প্রয়োজন? তোমরা একই সমান সুরে বীজ আর গাছে রয়েছ। তাই তোমরা তৈরী হও পরবর্ত্তী কাজের জন্য।**

বেদজ্ঞরা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, এখন তো দেশে শান্তি হয়ে গেল। এখন আমরা কি করবো? আমরা তো আরও কিছু চাই। এই যে ভগবান শুনছি, একথা আমরা উচ্চারণ করবো না। তোমরা তো বলে দিয়েছ, উচ্চারণ করলেই নাকি পুঁতে দেওয়া হবে। তাই ভগবানের নামও বলি না। কিন্তু এখন তো কিছু জানতে চাই। শিব বললেন, হ্যাঁ, এখন এমন একটা স্তরে তোমরা এসেছ যে, এখন তোমরা বলতে পার, এই সৃষ্টিটা কি করে এল? কোথা থেকে এল? কি তার গতি? কি তার প্রয়োজন? এই মূল তত্ত্ব, মূল কারণ জানার জন্য তোমাদের স্বরগ্রাম দেব। বেদজ্ঞরা বললেন, স্বরগ্রাম? সেটা আবার কি? শিব বললেন, তোমরা যে মরবে বুঝতে পেরেছ? তোমাদের মৃত্যু আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—তোমরা যে গর্ভে ছিলে, এটা তো জেনেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা গর্ভেই ছিলাম।

—উপলব্ধি তোমার নাই। কিন্তু তোমার ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজনের ছেলে, এই যে বাচ্চা বের হচ্ছে, তাতে বুঝতে

তো পারছো যে, তুমিও সেখানে ছিলে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভাবতে পার, তুমিও যে সেখানে ছিলে?

—আজ্ঞে না। অসুবিধা লাগে ভাবতে, কিভাবে যে পেটটার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু অসুবিধা লাগলেও যা দেখছি তাতে বুঝছি যে না থেকে তো উপায় নাই।

—ছিলে যে, এটা তো সত্যি কথা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছিলাম, এটা মানতেই হবে।

—যখন ছিলে, তখন কি একবারেই ছিলে? না তার আগেও কিছু ছিলে?

—আজ্ঞে, তার আগেও ছিলাম।

—তার আগে রক্ত ছিলে।

—আজ্ঞে, রক্ত তো ছিলামই। না থাকলে কি করে এলাম?

—রক্ত ছিলে, বীর্যে ছিলে। রক্তটা কিভাবে আসলো? রক্ত এল খাদ্যের থেকে। খাদ্য এল বাতাস থেকে। তারপর আলো এল, মাটি এল।

—আজ্ঞে, এতগুলো আমরা নাকি? আমাদের নামটা তাহলে কি?

চাল, ডাল, তেল, নুন সবটার মধ্যেই তো আমরা ছিলাম। বাবা তো সবই খেয়েছে। জল, বাতাস, আলো, মাটি, আপেল, আঙুর থেকে আরম্ভ করে দুধ, ফুচ্‌কা অবধি সবই খেয়েছে।

চাল, ডাল, তেল, নুন সবটার মধ্যেই তো আমরা ছিলাম। বাবা তো সবই খেয়েছে। জল, বাতাস, আলো, মাটি, আপেল, আঙুর থেকে আরম্ভ করে দুধ, ফুচ্‌কা অবধি সবই খেয়েছে।

—সবটা খেয়েই তো রক্ত হলো। রক্ত থেকে বীর্য হলো। তুমি জন্মগ্রহণ করলে। তাহলে তুমি আকাশে ছিলে, বাতাসে ছিলে এটা তোমায় ভাবতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এর মধ্যে যখন ছিলাম, তখন তো ভাবতেই হবে।

—তাহলে, আকাশ, বাতাস ছাড়া গতি নাই। কিন্তু এর আগে কোথায় ছিলে?

—আজ্ঞে, তাতো জানি না।

—বাবার ঠাকুরদাদা ছিল, বিশ্বাস কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, করি। আমি যখন আছি, তার বাবা তার বাবা আছে। নাহলে বাবা কোত্থেকে এল? এভাবে তার বাবা, তার বাবা করতে করতে বাবার গোষ্ঠী হয়ে যাবে। সেই বাবাদের না দেখলেও তার বাবা তার বাবা যে ছিল, নিজের বাবাকে দেখে এটা বিশ্বাস করি। তাই পূর্ববর্তী অনেক বাবা যে ছিল, না দেখলেও এটা মেনে নিতে পারি, অন্তরে গেঁথে নিতে পারি।

—আচ্ছা ভগবানকে তো দেখা যায় না, জানা যায় না। এমন কোন প্রমাণ এসে যদি দাঁড়িয়ে যায় যে, ভগবান আছেন, তাহলে বিশ্বাস করতে তো আপত্তি নাই?

আজ্ঞে, না না। বাবার পর বাবা যদি থাকে, বিচার বিশ্লেষণে যদি সেটা মেনে নেওয়া যায়, ভগবান সম্পর্কেও যদি এমন প্রমাণ, এমন অকাট্য যুক্তি থাকে, তাহলে আমরা বুঝেই নেব যে, ভগবান আছেন। তখন যেভাবেই হোক, সাধনা করে ভগবানের দরজায় গিয়ে পৌঁছবো। যেমন অর্থ থাকলে বিলাত যাওয়া যায়। বিলাত যেতে হলে টিকিট কাটতে হয়। যার পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নেই সে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করবে। তারপর টিকিট কাটার অপেক্ষা। ভগবান আছেন জানলে তাঁর দরজায় পৌঁছবার চেষ্টা শুরু করবো। কিন্তু ভগবান আছেন কি নেই, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

বিলাত যেতে হলে টিকিট কাটতে হয়। যার পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নেই সে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করবে। তারপর টিকিট কাটার অপেক্ষা। ভগবান আছেন জানলে তাঁর দরজায় পৌঁছবার চেষ্টা শুরু করবো।

—সেটাই তো কথা। ভগবান আছেন কি নেই, এটাই তো আগে জানা দরকার।

—আজ্ঞে, যদি বুঝতে পারি, ভগবান আছেন, তাহলে তো চুকেই গেল। তারপরে চেষ্টা করতে হবে, কবে কোথায় কিভাবে যাওয়া যায়। শুধু টিকিট কাটার অপেক্ষা। বিলাত না গেলেও পয়সার অভাবে যেতে পারি নাই, এটাই ভাবতে হবে।

এখনকার সাধু গুরু যারা ভগবানের কথা বলেন, যারা ভগবানের

নামে আছেন, তাদের কাছে অনেকে এসে বলে, 'বাবা, অনুভূতিতো নাই। তারা বলে, ব্যাটা তোর কাম আছে, ক্রোধ আছে। কাম ক্রোধ থাকলে ভগবান পাওয়া যায় নাকি রে, সে ভাবে, সত্যিই তো। আমার তো কাম ক্রোধ সবই আছে। গুরু আবার বলে, 'কাম ছাড়, ক্রোধ ছাড়, লোভ ছাড়, তবে তো ভগবান পাবি।' এরকম কথা বললে সে জীবনেও কোনদিন ভগবান পাবে না।

আমি যদি আমার কোন শিষ্যকে বলি, কাম না ছাড়লে ভগবান পাবি না, ক্রোধ না ছাড়লে ভগবান পাবি না, তবে শেষবেলা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে ভগবান পাবে না। কোনদিনই ভগবান পাবে না। কাম, ক্রোধ, লোভের জন্য ভগবান পাওয়া না পাওয়া, নির্ভর করে না। কারণ ভগবানই তো কাম।

—ভগবান কাম? সে আবার কি?

—সৃষ্টি যে করে, সেই কামুক; কামনাই কাম। কামনা বাসনা সব নিয়েই কাম। সে যে ব্যাটাই হোক। নাই ব্যাটাই হোক; আর হ্যাঁ ব্যাটাই হোক। সৃষ্টি যে করছে, তারই কাম আছে। সৃষ্টি করাটাই কাম। ভগবানকে ডাকাও কাম। হে ভগবান আমাকে দেখা দাও।

—এই যে কামনা, এটাও কাম।

—ভগবানকে ডাকাটাও কাম?

এক সাধুর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আমাকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমার তখন ১৪ বছর বয়স। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে বলছে, 'তুমি তো দেখছি ভাল পোষাক পরে এসেছ। তোমার দেখছি লোভ যায়নি, ভোগ করার ইচ্ছে যায়নি। এখনও তোমার সখ আছে, তুমি কি করে ব্রহ্মজ্ঞ হলে? দেখতো, আমি উলঙ্গ। আমার কোন বস্ত্র নাই, আমার শীত নাই, আমার সব বর্জন হয়ে গেছে। ব্রহ্মজ্ঞানী হতে হলে সব বর্জন করতে হয়। নাহলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তোমার এখনও সাজগোজ করার ইচ্ছা রয়েছে। তোমার কি করে ব্রহ্মজ্ঞান হবে? তুমি দেখছি, বাবু সেজে

এসেছ। হে বালক, তুমি কি করে ব্রহ্মজ্ঞ হবে? সে নিজে নিজে তার কথা বলে চলেছে। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, তোমার কিছু বলার আছে?'

আমি বলি, তোমার কথা শেষ হয়েছে? আচ্ছা, আমি এখন কিছু বলি?

—হ্যাঁ, তুমি বল।

আমি বলতে আরম্ভ করলাম। আমাদের দেশে যখন নাটক হয়, যে পাগল সাজে, গ্রীণরুম থেকেই সেজে আসে। যে বেটা রাজা সাজে সেও সেখান থেকেই সেজে আসে। হে সাধু, আমি যদি বলি, তুমি উলঙ্গের পার্ট নিয়ে বসেছ, আর আমি ভাল পোষাক পরা লোকের পার্ট নিয়ে এসেছি একই নাটকে, আপত্তি আছে? তুমি উলঙ্গের পার্ট করছো। সবাইকে বলছো, 'দেখ, আমি উলঙ্গ, আমি পাগল।' আর আমি বাবু সেজে পার্ট করছি। আপত্তি করার তো কিছু নাই।

আমাদের দেশে যখন নাটক হয়, যে পাগল সাজে, গ্রীণরুম থেকেই সেজে আসে। যে বেটা রাজা সাজে সেও সেখান থেকেই সেজে আসে। হে সাধু, আমি যদি বলি, তুমি উলঙ্গের পার্ট নিয়ে বসেছ, আর আমি ভাল পোষাক পরা লোকের পার্ট নিয়ে এসেছি একই নাটকে, আপত্তি আছে?

সে রাগ করে তার ভাষায় কথা বলে ওঠে।

আমি বলি, 'ও বাবা, রাগও আছে।' জানো ত, এক ওস্তাদ কুস্তিগীর গিয়েছিল আরেক ওস্তাদ কুস্তিগীরের বাড়ীতে (আগরতলা) লড়াই করতে। কুস্তিগীর তো স্নানের জন্য তেল চেয়েছে। সেই ওস্তাদ কুস্তিগীর ঘর থেকে একমুঠো সরষে এনে দিয়েছে।

—এ কি তেল কোথায়?

—আমরা তো তেল কিনি না। সরষে থেকে সঙ্গে সঙ্গে তেল বানিয়ে নি।

—সরষে থেকে তেল বানাও, সেটা আবার কি?

—হ্যাঁ, আমরা বস্তা ভরে সরষে আনি। তারপর তেল বানিয়ে বানিয়ে গায়ে দি।

—কেমন করে তেল বানাবো?

—জোরে টিপ দাও।

কুস্তিগীর তো টিপ দিয়ে তেল বানাতে পারে না। তখন যার বাড়ীতে গেছে, সেই ওস্তাদ কুস্তিগীর বলে, 'কি হে কুস্তিগীর পারছো না? দাও, দাও, দাও, দাও, আমাকে দাও'। সে সরষে হাতে নিয়ে এক টিপ দিয়ে তেল বার করে ফেলেছে। তারপর বলছে, 'এই নাও তেল।'

এই না দেখে ঐ কুস্তিগীর একেবারে পগার পার। ওরে বাবা, যে সরষে টিপ দিয়ে তেল বার করতে পারে, সে আমাকে টিপ দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করতে কতক্ষণ? এর সাথে লড়াই করতে গিয়ে দেখবো যে, 'আমি নাই।'

যে সরষে টিপ দিয়ে তেল বার করতে পারে, সে আমাকে টিপ দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করতে কতক্ষণ? এর সাথে লড়াই করতে গিয়ে দেখবো যে, 'আমি নাই।'

আমি ঐ সাধুকে একটুখানি ছেড়ে দিয়েছি, দেখি চটে কি না। এমন চটে গেছে যে, মুখ দিয়ে যেন খৈ ফুটছে। তখন বললাম—হে সাধু!

—কি বলছো?

—একটা ব্যাঙে যদি একটা হাতীকে লাথি দেখায়, হাতী চটবে?

—না, চটবে কেন?

—ব্যাঙের লাথি। হাতী হাসতে হাসতে চলে যাবে। একটা ব্যাঙ, ওর সাথে যুদ্ধ করা লজ্জা ছাড়া আর কি? আমি তো বাবু। আমার সখ আছে লোভ আছে। আমি একটা কথা বললাম, তাতেই এমন চটে গেলে? তুমি না হাতী?

—মাঝে মাঝে আমার রাগ হয়।

—এক গ্রীণরুম থেকে সেজে আমরা মঞ্চে এসেছি।

আমি বাবুর পার্ট, তুমি উলঙ্গের পার্ট, তাতেই রাগ হয়ে গেল? রাগও তোমার অভ্যাস। রাগ ঢাকতে গেলে তিনখানা মিথ্যা কথা বেড়িয়ে যাবে। একটাই আগে ঠিক কর। সাধু বলে, আমি কাম ছেড়ে দিয়েছি।

—কি বলছো সাধু, তুমি কাম ছেড়েছো? কাম পৃথিবীতে কেউ ছাড়তে পারে না। এদিকে হোম চলছে, যজ্ঞ চলছে। আমি বাচ্চা ঠিকই। কিন্তু বাচ্চা হলেও বুলেট। আমি ঢিল না। তাই বন্দুকের আগা থেকে যখন যাই, একেবারে ভেদ করে বেড়িয়ে যাই। ভুলে যেও না সাধু, আমি পোষাকই পরি, আর যাই করি, তোমাকে ভেদ করে বেড়িয়ে যাব। তুমি শোন, কাম ত্যাগ হয় না। কাম ত্যাগ করেছ যদি বল, মিথ্যাবাদী তুমি। কাম ত্যাগ করতে কেউ পারে না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কারোর কাম ত্যাগ হয়নি। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কাম থাকবে।

আমি বাচ্চা ঠিকই। কিন্তু বাচ্চা হলেও বুলেট। আমি ঢিল না। তাই বন্দুকের আগা থেকে যখন যাই, একেবারে ভেদ করে বেড়িয়ে যাই।

সাধু বলে, তুমি এতবড় কথা বললে?

—হ্যাঁ। বললাম। আমি জন্ম থেকে এই বেদের সুর নিয়ে আছি। আমি না জেনে কোন কথা বলি না। যারা বলেন কামত্যাগ করেছেন, কামত্যাগ করে ভগবান পেয়েছেন, মিথ্যাকথা বলেছেন। কাম শুধু লিঙ্গেই নয়। চোখে দেখা কাম। হে সাধু, কানে শোনাও কাম। তৃপ্তিই কাম। মূর্তি দেখে আনন্দ, এই তৃপ্তিই কাম। জিহ্বার স্বাদে আনন্দ, সেটাও কাম। সবই তো ইন্দ্রিয়, সবই লিঙ্গ। শুধু মূত্রদ্বারই লিঙ্গ নয়। একই চামড়ায়, একই রক্তে, একই দেহে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই লিঙ্গবৎ, লিঙ্গ সর্বত্র বিদ্যমান। ত্বকের স্পর্শে তৃপ্তি, ত্বকের স্পর্শ লিঙ্গবৎ। তুমি কি বলছো সাধু? পাশেই বড় বড় রুটি ভাজছে ঘি দিয়ে। তুমি ঘি দিয়ে রুটি খেতে ভালবাস না?

সাধু বলে, হ্যাঁ খুব ভালবাসি।

—গান শুনতে ভালবাস না?

—হ্যাঁ, ভালবাসি।

—এই দ্বারগুলো সব ঠিক আছে। একটা দ্বার দিয়ে শুধু কৌপীন সাঁটছো? দূর, রাখ তোমার কথা, মিথ্যাবাদী কোথাকার। তুমি মিথ্যা কথা বলছো। নিন্দা করে কারা? মূর্খরা। সমালোচনা করে কারা? অজ্ঞরা। তুমি আমার নিন্দা করেছ, সমালোচনা করেছ। যারা বিজ্ঞ, বিদ্বান্ তারা জ্ঞানী

নিন্দা করে কারা? মূর্খরা। সমালোচনা করে কারা? অজ্ঞরা। তুমি আমার নিন্দা করেছ, সমালোচনা করেছ। যারা বিজ্ঞ, বিদ্বান্ তারা জ্ঞানী ব্যক্তির সমাদর করে।

ব্যক্তির সমাদর করে। তুমি না বুঝে আমাকে গালি দিয়েছ। তোমার কথায় আমি রাগ করিনি সাধু। আমি উপহাস করেছি। তোমার কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। এখন আমি তোমাকে আক্রমণ করেছি। আমি অপারেশনের যন্ত্র হাতে নিয়েছি। তোমার গল্‌তি, তোমার গলদ সব বার করে দিয়ে আমি তোমাকে পরিষ্কার করে দিয়ে যাব সাধু। এই যে চারিদিকের মনোরম দৃশ্য, পাহাড়, পর্বত, ঝরণা, ফুল—এসব দেখতে ভালবাস না? সব ভালবাস। সব কাম।

—তাহলে ভগবানকে যারা ডাকে, তারা কেন বলে কাম ছাড়, ক্রোধ ছাড়?

—একথা কেউ বলবে না। যারা বলছে, তারা ভুল বলছে। কারণ ভগবানকে ডাকাটাও কাম।

সাধু বলে ওঠে, ভগবানকে ডাকাটাও কাম?

হ্যাঁ। কোন্ দরজা দিয়ে সে ভগবানকে ডাকছে? এই লিঙ্গের দরজা দিয়ে। এই লিঙ্গের দরজা দিয়েই বলছে, 'হে ভগবান আমাকে কৃপা কর। আমাকে ভালবাস'। কোন্ চোখ দিয়ে সে ভগবানের দর্শন কামনা করছে? কোন্ কান দিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে গান নিবেদন করছে? অন্তরের এই আকুলতা, অন্তরের এই ভালবাসাই কাম। আগেই বলেছি, তৃপ্তিই কাম, satisfaction-ই কাম। সেইভাবেই তোমাকে কথা বলতে হবে সাধু। তোমার মতবাদ চলবে না। কাম থাকবে, ক্রোধ থাকবে। মিকশ্চারে সব কিছু থাকবে। একটা লিঙ্গেই শুধু কাম নয়, সাধু মনে রাখবে, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই লিঙ্গবৎ।

অন্তরের এই আকুলতা, অন্তরের এই ভালবাসাই কাম। আগেই বলেছি, তৃপ্তিই কাম, satisfaction-ই কাম।

—ব্রহ্মচর্য কাকে বলে।

—সমান সুরে সমতা রক্ষাই ব্রহ্মচর্য। শুধু বীর্যরক্ষাই ব্রহ্মচর্য নয়। সমান সুরে সমতার সুরে যে থাকবে, সেই ব্রহ্মচর্য রক্ষা করবে। সুতরাং তুমি যেভাবে বলছো সাধু, সেটা হয় না কখনও। তাহলে মানুষ হতাশ হয়ে যাবে। জীবনে আর কেউ ভগবানকে পাবে না।

আমার শিশুবয়সের সেই কথা আমি অনেককে বলেছি। আমি তখন একবেলা সাবু আর একবেলা ভাত খেতাম। তখন সাবুর দর সস্তা ছিল ১৪ পয়সা করে। আমি সাবু আনতে গেছি। আমার কাছে পয়সা কম ছিল। ভাবলাম, বাকীতে নিয়ে যাই। তাকিয়ে দেখি, দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা, 'আজ নগদ, কাল বাকী।' আমি ভাবলাম, 'আজ কোনরকম করে চালিয়ে নিই। কাল এসে নিয়ে যাব।' কালকে আবার বাকীতে আনতে গেছি। তাকিয়ে দেখি, 'আজ নগদ কাল বাকী।' বুঝলাম কোনদিই আমার বাকীতে নেওয়া হবে না। আমি ফিরে চলে এলাম।

সমান সুরে সমতা রক্ষাই ব্রহ্মচর্য। শুধু বীর্যরক্ষাই ব্রহ্মচর্য নয়। সমান সুরে সমতার সুরে যে থাকবে, সেই ব্রহ্মচর্য রক্ষা করবে।

এখানেও ঠিক তাই। এখানকার সাধুগুরুরাও এরকম। যখনই কেউ ভগবানকে পাবার জন্য আকুলিবিকুলি করে, ওরা বলে দেয়, তোমার অভিশপ্ত জীবন। তোমার কাম রয়েছে, ক্রোধ রয়েছে, মন অস্থির, মন চঞ্চল। তোমাকে একটা বিশেষ ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। এইসব ভেল্কি ভাল্কি তারা এমনভাবে দিয়ে দেয়, যাতে আর ভগবানের জন্য চিৎকার না করে। ভগবান চাইতে গেলেই একটা ধাক্কা দিয়ে দেয়, কাম, ক্রোধ না ছাড়লে হবে না। ওরা জানে, 'কাম, ক্রোধ ছাড়তে পারবো না, ভগবানও পাবো না। আর ঘুরে লাভ কি?' তখন তারা চলে আসে।

তাতো নয়। বেদতো এইভাবে কাউকে নিরাশ করে না। বেদ বলছে, তোমার মাঝে সবকিছু বিদ্যমান। তোমার সবকিছু থাকবে, তা সত্ত্বেও তুমি সেই মহাসুরে চলে যাবে। তারই স্বরগ্রাম শিব নিজহাতে দিয়ে গেছেন — বেদের সার কথা, সার মর্ম। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সেই ৫০০ বছর আগে যেভাবে দান করেছিলেন সেই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর — হরেকৃষ্ণ হরেরাম; তারই সারকথা, সারমর্ম, সারগর্ভ হচ্ছে রাম নারায়ণ রাম।

মহাপ্রভু দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছেন হরেকৃষ্ণ হরেরাম। তিনি বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের কথা শুধু বলেননি। তিনি কৃষ্ণকে দেখেছেন আকাশে। সেই অনন্ত মহাকাশরূপী কৃষ্ণ, নীলবর্ণ কৃষ্ণ, সেই আকাশ থেকে যে ধারা, সেই ধারাই হচ্ছে রাধা। ধারাকে যদি বারবার উচ্চারণ

করা যায়, তবে ধারাই হয় রাধা। সেই রাধাকৃষ্ণের মিলনের সুর লীন হয়ে আছে মহাকাশের বুকে। রাধাকৃষ্ণের মিলনে অনেকে এখানে প্রেমের দৃষ্টান্ত দেয়। এই প্রেমের দৃষ্টান্তে রাধাকৃষ্ণ এখানে নয়। আকাশের কৃষ্ণ, আকাশের রাধা। আকাশের মিলন, আকাশের ধারা। সেই ধারাই হ'ল রাধা। এই রাধাকৃষ্ণের সমান সুরের, সমান বর্ণনায় হ'ল হরেকৃষ্ণ। যেই কৃষ্ণ হরণ করে নিয়ে যান সেই মহাকাশে, সেই কৃষ্ণকে স্মরণ করে হে কৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ উচ্চারণ করে করে দিবারাত্র অবিরাম যে ধারায় তিনি কাঁদতেন, সেই ধারা অনুযায়ী, সেই ধারায় সৃষ্ট এই অনন্ত মহাকাশ, এই অনন্ত মহাজগৎ। তাই চিরযুগের চিরকালের সূত্র ধরে ধরেই এইভাবেই স্বরগ্রামের সূত্র দিয়েছিলেন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব।

—হরেকৃষ্ণ হরেরাম। রা হচ্ছে আয়ন, ম হচ্ছে মুক্ত আকাশ। মুক্ত আকাশে আয়ন করেছেন নারায়ণ। মুক্ত ভাবে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে আয়ন করা যায়, আহ্বান করা যায়, যাঁকে আশ্রয় করা যায়, তিনিই নারায়ণ। নারায়ণ যিনি আয়ন করেছেন, আনয়ন করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে, সেই নারায়ণকেই স্মরণ করি। তাই মুক্তাকাশের মুক্ত নাম মুক্ত ভাবে যদি স্বরগ্রাম হিসাবে দিবারাত্র স্মরণ করা যায়, তবে মহাকাশের মহা সুরে চলে যাওয়া যায়। সেই নামই এই নাম, সেই স্বরগ্রাম — রাম নারায়ণ রাম।

মহাপ্রভু সেই ভাবেই হরেকৃষ্ণ হরেরাম মহাধ্বনি উচ্চারণ করে করে সবাইকে এক জাতি, এক নীতিতে আনয়ন করবার চেষ্টা করেছিলেন। বেদজ্ঞরা এইভাবেই সমস্ত দ্বারে দ্বারে দিয়ে গেলেন সেই সুর। সুরটা কি যন্ত্রে বাঁধা? সেই যন্ত্র কাঠের যন্ত্র নয়, তারের যন্ত্র নয়। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে, এই সপ্তবীণায় সপ্তসুরে বাঁধা আছে সেই সুর। মূলাধারে মূলগ্রন্থিতে সেই গহ্বরে অনন্তনাগ বিড়া পাকিয়ে বসে রয়েছেন। **কৃষ্ণ যে বংশের বাঁশী (বাঁশের বাঁশী নয়) বাজালেন, সেটি অনন্তকোটি, অনন্তগ্রহের, অনন্তবংশের বাঁশী। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আজ্ঞা এবং সহস্রারে তিনি সেই বংশী ধ্বনি দিলেন। সেই বংশী বাজাতে বাজাতে বেদের সেই বিরাট সর্পকে গহ্বর থেকে জাগ্রত করলেন।** তারপর সেই সর্প উঠতে উঠতে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ফণা

বিস্তার করতে করতে সহস্রারে সহস্রধারায় বিস্তার লাভ করলেন। সেই সর্প মহাজ্ঞানী; মহাজ্ঞানে মহাধ্যানে মহা অংশ গ্রহণ করলেন। সেইভাবে সেই ধ্বনিকে, সেই সুরকে আশ্রয় করলেন। সুরই হচ্ছে সর্পের ধারা। সেই সুরধ্বনির ধ্বনি সর্পই একমাত্র শ্রবণ করে; তার তালে তালেই সুর ধ্বনিত হয়। সেই বিরাট সর্প সুর ধ্বনির তালে তালে অনাহতে এলেন। তারপর বিশুদ্ধে শোধন করে সেই বিষকে সংশোধন করে সেই বিষকে হরণ করলেন। ক্রমে ক্রমে আজ্ঞাচক্রে সহস্রারে লীন হলেন। দেহবীণাযন্ত্রে বাজাবার জন্য শিব এবং বিষ্ণু এই মহানাম, মহাস্বরগ্রাম দান করলেন দেবর্ষি এবং বেদজ্ঞদের। তাঁরা দেবর্ষিকে বললেন, 'তুমি এই যন্ত্র বাজাও।' মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠানে, স্বাধিষ্ঠান থেকে সহস্রারে বাজাবার জন্য তাঁরা বেদজ্ঞদের বললেন। দেহবীণার সপ্ত সুরে বাঁধা এমন এক যন্ত্র যে যন্ত্রে আছে শিবশক্তি, যে যন্ত্রে আছে প্রকৃতি পুরুষের মিলন, যে যন্ত্রে আছে রাধাকৃষ্ণ, যে শক্তিতে আছে শিবশক্তির ধারার ধারা। সেই ধারা মহাধারার অনন্ত শক্তিতে যুক্ত। এই যুক্ত ধারাই হচ্ছে এই পৃথিবীর ধারাপাতা। এই পৃথিবী হচ্ছে ধরা। ধরাই হচ্ছে ধারা। এই ধরার ধারাপাতায় রয়েছে বিবেক, বুদ্ধি, বিচার। আমাদের জীবনের চিন্তাধারার ধারা আমাদের চিনতে হবে। আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। আমাদের স্বরলিপি শিখতে হবে। স্বরগ্রাম সাধতে হবে। আমাদের তৈরী হতে হবে। সেই স্বরগ্রামের মধ্যেই রয়েছে সবকিছু।

আমার শিশুবয়স থেকে সেই চিন্তাধারার ধারা, সেই মহাশক্তির মহা সুর ধ্বনি নিয়ে আমি এসেছি। সেই স্বরগ্রাম নিয়ে আমার সন্তানদের নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। নানা সম্প্রদায় থেকে আমাকে বিভ্রান্ত করার জন্য, আমার জীবননাশ করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তখন আমার ১২/১৩ বছর বয়েস। ঘরে ৬/৭ হাত লম্বা সাপ ছেড়ে দিয়েছে, নৌকা ফুটো করে মাঝনদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে জলে ডুবিয়ে মারবার জন্য। তার কারণ সাধু সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মঠ, মন্দির, আশ্রমগুলো সমাজের পরগাছা স্বরূপ। ধর্মের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে এরা পয়সা উপার্জ্জন করছে। এদের বিরুদ্ধেই আমি প্রচার করে যাচ্ছি।

সাধু সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মঠ, মন্দির, আশ্রমগুলো সমাজের পরগাছা স্বরূপ। ধর্মের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে এরা পয়সা উপার্জ্জন করছে। এদের বিরুদ্ধেই আমি প্রচার করে যাচ্ছি।

আপনাদের কাছে আমি গুরু হয়ে আসি নাই। আমি ব্রহ্মচারী, অবতার, পূর্ণ অবতার, হয়ে আপনাদের কাছে আসি নাই। আপনারা আপনাদের ঘরের সন্তান হিসাবে আমাকে ঠাঁই দেবেন। তাহলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। আমি এসেছি বেদের বাহক হিসাবে। বেদের প্রচারক হিসাবে সাধারণ হয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি নিজেকে ব্রহ্মচারী, সাধু, ঠাকুর, মহাপুরুষ ইত্যাদি বলতে রাজী নই। আমি কর্মী, আমি চাষী, আমি ক্ষেতী। আমি দ্বারে দ্বারে মন্ত্র দিচ্ছি, দীক্ষা দিচ্ছি সবাইকে এক সুরে আনার জন্য। আজ আমার ৭০ লক্ষ শিষ্য। বাংলা, ভারতবর্ষে এত শিষ্য আর কারও আছে বলে আমার মনে হয় না। তাই দ্বারে দ্বারে আমি দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। কেন দিচ্ছি? কারণ আমি চাই আমার বেদের সুর জেগে উঠুক।

এখানকার বেশীরভাগ সাধু গুরুরা কি করে জানেন? কি করে শিষ্যকে আটকিয়ে রাখবে আর তার মাথায় হাত বুলিয়ে পয়সা রোজগার করবে, তারজন্য নানান ফন্দিফিকির খুঁজতে থাকে। আমার তো কখনই এরকম মনে হয় না। আমি যদি মনে করি, শিষ্যকে আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দেব। গুরু কখনও ত্যাগ হয় না। পাঠশালায় যারা পড়েছে, তারা কি স্কুলে পড়ে না? সেই পাঠশালার মাষ্টারকে দেখলে আজও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। আজও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সে পায়। সুতরাং পাঠশালায় মাষ্টার ত্যাগ হয় না। ছেলে যখন কলেজে যায়, স্কুলের মাষ্টার ত্যাগ হয় না। তারপর ইউনিভার্সিটি, তারপর কর্মস্থল।

লক্ষ লক্ষ সন্তান আসছে আমার কাছে। আমি দীক্ষা দিচ্ছি। আমার কাছে দীক্ষা নিতে টাকা লাগে না, পয়সা লাগে না; দিল লাগে, অন্তর লাগে। কারণ এই যে দীক্ষা নিতে দিন লাগে, ক্ষণ লাগে, কাপড়-চোপড় লাগে, সোনারূপা লাগে — এগুলো হল ব্যবসায়ীদের ব্যবসার বিধান। আমি ক্ষেতী, একটা একটা করে যদি সরষে পোঁতা হতো, তবে সেই সরষে কেউ খেতে পারতো না। আমি ক্ষেতী, তাই ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ লক্ষ সন্তানকে আমি মহাকাশের বেদমন্ত্র দান করে যাচ্ছি। বেদমন্ত্রের সাথে সাথে রাম নারায়ণ রাম মহানাম দিয়ে যাচ্ছি। তাই দ্বারে দ্বারে এই নাম প্রচার

আমি ক্ষেতী, তাই ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ লক্ষ সন্তানকে আমি মহাকাশের বেদমন্ত্র দান করে যাচ্ছি। বেদমন্ত্রের সাথে সাথে রাম নারায়ণ রাম মহানাম দিয়ে যাচ্ছি।

করছি আপনাদের সন্তান হিসাবে। আমি অন্য কিছু চিন্তা করে আপনাদের কাছে আসিনি। আমি এসেছি আপনাদের কাছে আপনাদের সন্তান হিসাবে থাকতে। আমি বেদের বাহক, বেদের প্রচারক, বেদ আমার রক্ত। আমি অনর্গল ৪০০ শব্দ মিনিটে ব্যবহার করতে পারি। ঘন্টার পর ঘন্টা অনর্গল বেদমন্ত্র বলে যাব। বেদই আমার রক্ত, বেদই আমার মাংস, বেদই আমার ধারা, বেদই আমার ধরা। বেদের পূজারী আমি। আপনারা বেদের বংশের লোক। আপনাদের রক্ত বেদের। আপনারা বেদের ধারা ধরে ধরে এগিয়ে যান। সেই চিন্তা করে আপনারা কাজ করুন।

আমি পরিশ্রম করলাম। রাজনীতির বক্তৃতা এটা নয়। এটা বেদের বক্তৃতা। বেদের কথা তারা বলে না। বেদের বক্তৃতা তারা জানে না। বেদের কথা বলতে গেলে তাদের বোঁচকা খালি হয়ে যাবে, আশ্রম থাকবে না, সাধু সন্ন্যাসী আর থাকবে না। আজ আপনারা ঘরে ঘরে 'রাম নারায়ণ রাম' মহানাম প্রচার করুন। আমি যে সন্তানদল গড়েছি, এটা ব্যক্তিগত নয়। জগতের সন্তানদের নিয়েই আমি সন্তানদল গড়েছি। তারা ঘরে ঘরে বেদ প্রচার করুক; আপনারা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। রাম নারায়ণ রাম মহানাম প্রচার করে বেদমন্ত্রের প্রসারতা করুন। তাই দেবর্ষি নারদ যখন শিব এবং বিষ্ণুর থেকে নিয়ে গেলেন সেই মহামন্ত্র, তখন বললেন, রাম নারায়ণ রাম। শিব ত্রিশূল হাতে লিখলেন রাম নারায়ণ রাম। এইভাবে দ্বারে দ্বারে বেদজ্ঞরা সর্বত্র প্রচার করেছিলেন এই রাম নারায়ণ রাম। মুক্তবাণী, মুক্তকণ্ঠ, মুক্ত আকাশ হতে এই বাণী আনীত হয়েছিল। তারই স্বরগ্রাম হিসাবে এই বাণী দান করলেন সমাজে।

দ্বারে দ্বারে বেদজ্ঞরা সর্বত্র প্রচার করেছিলেন এই রাম নারায়ণ রাম। মুক্তবাণী, মুক্তকণ্ঠ, মুক্ত আকাশ হতে এই বাণী আনীত হয়েছিল। তারই স্বরগ্রাম হিসাবে এই বাণী দান করলেন সমাজে।

আমি আপনাদের কাছে, আমার ভাইবোনদের কাছে, সেই বেদের যুগের চিন্তা করে, সেই যুগ যাতে ফিরে আসে, তারই রক্ত হিসাবে আপনাদের কাছে বলে গেলাম; বেদের বাণী তুলে ধরলাম। আপনারা গ্রহণ করলে আমি খুব আনন্দিত হবো। আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

এখনকার শিক্ষা আত্মকেন্দ্রিক আর বেদের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্যাপ্তিকেন্দ্রিক

সুখচর ধাম
১৬ই নভেম্বর, ১৯৭৬

বেদের যুগে বেদজ্ঞ ঋষিগণ সারা ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষার্থীরা বলতো, আমরা তোমাদের স্মৃতি। আমরা তোমাদের স্মরণ করছি। আমাদের সহজ সরল মন নিয়ে যেন দেশের সেবা, দশের সেবা করতে পারি। আমরা যেন নিজের ভিতরকে পবিত্র করতে পারি, সুন্দর করতে পারি। সেই শিক্ষাই আমরা এই পবিত্র স্কুল থেকে পাচ্ছি। সেই আশীর্বাদ তোমরা (বেদজ্ঞ ঋষিগণ) আমাদের করবে। আমরা আর কিছু জানি না, আর কিছু বুঝি না। সেই যুগে তারা এই রকমভাবে সাধনা করতো। অন্য কোন সাধনা তাদের ছিল না। কোন সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণের কথা তারা বলতো না। বাস্তব জীবনে কিভাবে তৈরী হওয়া যায়, সেই চিন্তা, সেই কথাই ছিল তাদের একমাত্র কথা।

অন্য কোন সাধনা তাদের ছিল না। কোন সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণের কথা তারা বলতো না। বাস্তব জীবনে কিভাবে তৈরী হওয়া যায়, সেই চিন্তা, সেই কথাই ছিল তাদের একমাত্র কথা।

তারা প্রার্থনা করতো তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে। কিভাবে তোমাদের মত মননশীল হওয়া যায়, তোমাদের মত মন পাওয়া যায়, ব্যাপক হওয়া যায়, উদার হওয়া যায়, সেইটাই তারা কামনা করতো। এইটা ছিল তাদের mental satisfaction তারা বলতো, এইটা আমাদের মনের তৃপ্তি। Mental satisfaction হিসাবে পূর্বপুরুষদের (বেদজ্ঞদের) activities গুলি স্মরণ করবার জন্য তাদের স্কুল থেকে নির্দেশ দেওয়া হতো। তাদের (শিক্ষার্থীদের)

বলা হত, তোমরা ওঁদের (পূর্বপুরুষদের) কথা স্মরণ কর। ওঁরা কি করে গেছেন আমাদের জন্য, এইটা তোমাদের স্মরণ করা উচিত। তাদের গ্রন্থে আছে যে, মহান ব্যক্তি যাঁরা, উদার ব্যক্তি যাঁরা, তাঁদের কথা স্মরণ করে তোমরা সবসময় চলবে।

মহান, উদার ব্যক্তি কে? সূর্য উদার আমরা দেখতে পাচ্ছি। বায়ু উদার, জল উদার, মাটি উদার। তাঁদের কথা তোমরা স্মরণ কর। তাঁরা বীর, তাঁরা উদার, তাঁরা সাধক। তাঁরা বীর কর্মী। তাঁদের কথা স্মরণ করে তোমাদের পথ বেছে নেবে। সদা সর্বদা তাঁদের কথা স্মরণ করবে। স্কুলের যাঁরা বড় বড় অধ্যাপক, যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের কথা স্মরণ করে আশীর্বাদ চেয়ে নেবে। অন্তরে অন্তরে কামনা করবে, আমরা যেন তোমাদের মত হতে পারি, দেশের দশের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারি। দেশের কাজে মনপ্রাণ সঁপে দিতে পারি। আমাদের সেই আশীর্বাদ কর। তাদের কবিতা, গান সেইভাবেই রচিত হতো। এখনকার মতো কোন কিছুই ছিল না। কোন কল্পনা, গল্প, অবাস্তব কথা, অবান্তর কথা, উচ্ছ্বাসের স্থান ছিল না। এসব ছিল একেবারে নিষিদ্ধ।

তাই তোমাদের বলছি, এখনকার শিক্ষা আত্মকেন্দ্রিক। আর বেদের যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্যাপ্তিকেন্দ্রিক। তাদের শিক্ষা ছিল অন্য ধরণের। কবিতাগুলি ছিল অন্যরকমের। বুঝতে পারছো কবিতাগুলি কি রকমের ছিল? সূর্য, বায়ু, জল, আকাশ নিয়ে কবিতা রচিত হতো। অধ্যাপকরা একেকজন বীরকর্মী ছিলেন, বীর সাধক ছিলেন। শিক্ষার্থীরা তাঁদের কথা ভাবতো। তাঁদের কাছে এসে মাথা নত করে বলতো, 'তোমাদের মত যেন হতে পারি।' এই কথা তারা সবসময় স্মরণ করতো। আর ছাত্ররা ছিল অধ্যাপকদের কাছে নিজের heart যাকে বলে, সেই heart. এরচেয়ে বড় আর কিছু নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের heart ছিল। অধ্যাপকেরা দূর থেকে এলে তারা মাথা নত করে থাকতো। অধ্যাপকদের যে কি শ্রদ্ধা করতো, সেটা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আর এখানকার ছাত্র মাষ্টারের যে সম্পর্ক দেখলে লজ্জা

এখনকার শিক্ষা আত্মকেন্দ্রিক। আর বেদের যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্যাপ্তিকেন্দ্রিক। তাদের শিক্ষা ছিল অন্য ধরণের। কবিতাগুলি ছিল অন্যরকমের।

লাগে। এখানে ছাত্র মাষ্টারের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলার কিছু নাই। কি সম্পর্ক যে চলছে — মোটেই সুন্দর নয়। তখনকার ছাত্র মাষ্টারের সম্পর্ক ছিল মধুর। সেটা ফিরে আসতে ২০০ বছর লাগবে। এমন মধুর সম্পর্ক ছিল, তারা অধ্যাপকদের 'প্রভু' বলে সম্বোধন করতো।

বেদের যুগে শিক্ষার্থীদের খাওয়া-দাওয়া ছিল নিয়মমতো। পাখিরা যেমন সন্ধ্যা লগনে খায়, ওরাও সন্ধ্যা লগনে আহার শেষ করতো। জীবজন্তু পশুপাখিরা বেশীরভাগই সন্ধ্যা লগনে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আহার শেষ করে। তাদের আহারও শেষ হতো সূর্যাস্তের সাথে সাথে। তারা আগুন জ্বালতো। গ্যাসের বাতি জ্বালাতো। গ্যাস তৈরী করতো। রাস্তায়ও গ্যাসের বাতি জ্বালাতো। সলতে দিয়েই হোক বা অন্য যেভাবেই হোক, কিভাবে যে আলো জ্বালাতো জানি না। এই যে বড় রাস্তা, এই রাস্তায়ও গ্যাসের বাতি জ্বলতো।

বেদের যুগে শিক্ষার্থীদের খাওয়া-দাওয়া ছিল নিয়মমতো। পাখিরা যেমন সন্ধ্যা লগনে খায়, ওরাও সন্ধ্যা লগনে আহার শেষ করতো। জীবজন্তু পশুপাখিরা বেশীরভাগই সন্ধ্যা লগনে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আহার শেষ করে। তাদের আহারও শেষ হতো সূর্যাস্তের সাথে সাথে।

সেইসময়ে এখনকার মতো আমবাগান, জামবাগান ছিল না। রাস্তার দুপাশে নানারকম ফলের গাছ ছিল। রাস্তায়ই তো কত হাজার হাজার লক্ষ মাইল জমি চলে যেত। ঐ জমিই তো যথেষ্ট। এমনি বাগানে আর কতটা জমি থাকে। ৫০০ মাইল যদি একটা রাস্তা হয়, কথাটা বুঝে নিও, দু'দিকেই জমি পাচ্ছে। ৫০০ মাইলেই তো ফলের গাছ। এদিকে ৫০০ মাইল, রাস্তার ওদিকে ৫০০ মাইল, কথাটা বুঝতে পারছো তো? দু'দিকেই ৫০০ মাইল, ৫০০ মাইল করে কত রকমের ফলের গাছ। তারা (বেদজ্ঞরা) বলতেন, গাছ যত বেশী করবে, তত বেশী স্বাস্থ্য ভাল হবে, অক্সিজেন বেশী পাবে। আর বৃষ্টি হবে। গাছ বেশী হলেই বৃষ্টি হয়। তাঁরা এদিকে খুব খেয়াল করতেন। Mathematics (গণিতটা) খুব ভাল জানতেন। Calculation খুব ভাল করতেন। এই star-এর calculation (ক্যালকুলেশন্) করতে শেখাতেন। তারপর দিন, ক্ষণ, তারিখ, এগুলোর

Mathematics (গণিতটা) খুব ভাল জানতেন। Calculation খুব ভাল করতেন। এই star-এর calculation (ক্যালকুলেশন্) করতে শেখাতেন। তারপর দিন, ক্ষণ, তারিখ, এগুলোর calculation করতে শেখাতেন।

calculation করতে শেখাতেন। সমস্ত Mathematics খুব ভাল শেখাতেন। সবই ছিল practical (প্র্যাক্‌টিক্যাল)। Practical ছাড়া কিছু নেই। তারপর অস্ত্র উপচারগুলো অর্থাৎ চিকিৎসা বিদ্যায় অপারেশন করা, অস্ত্র ধরা ভাল শেখাতেন। একই স্কুল থেকে সব শিক্ষা দেওয়া হতো। আলাদা কোন Medical College (মেডিকেল কলেজ) ছিল না। ঐ এক কলেজেই সব শিক্ষার ব্যবস্থা। আর অধ্যাপকগণের মধ্যে একেকজন অনেক subject (সাবজেক্ট) জানতেন। একেকজন ৭/৮টা subject শিক্ষা দিতেন। ৭ জন করে শিখতো। প্রায় সবকিছুই শেখা হয়ে যেত। তারা period (পিরিয়ড) নষ্ট করতো না। ৭/৮ ঘন্টা ধরে শেখানো হ'ত। সময় নষ্ট করার কথা তারা চিন্তাও করতো না।

বেদের স্কুলে খেলাধুলা, চাষবাস থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে একটানা শিক্ষা দিয়ে চলতো। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সবাইকে শিখতে হ'তো। চিকিৎসা বিদ্যা কমবেশী সকলের ছিল। এই দুইটা শিখবেই। ইঞ্জিনিয়ারিং আর চিকিৎসা, এই দুইটা compulsory ছিল। প্রত্যেককে শিখতে হতো। স্থাপত্য শিল্প ঘরবাড়ী তৈরী করা, এইটা শিখবেই। তারপর ভাস্কর্য শিল্প, মূর্ত্তি তৈরী করা, পাথর কেটে কেটে মূর্ত্তির shape (আকার) করা, তাও শিক্ষা দেওয়া হতো। অধ্যাপকেরা অসীম যত্নসহকারে শিক্ষা দিতেন।

একজন ছাত্র এক অধ্যাপকের মূর্ত্তি এঁকে নিল। অধ্যাপক জানতেও পারলেন না। তিনি বসে আছেন। ছাত্রটি পড়া শেষ করে গভীর নিষ্ঠা সহকারে পাথর কেটে কেটে অধ্যাপকের মূর্ত্তি তৈরী করে তাঁর হাতে দিল। Exact (হুবহু) তাঁর মূর্ত্তি তৈরী করে দিয়েছে। অনবদ্য পাথরের কাজ। অধ্যাপক ছিলেন বীরকর্মী। মূর্ত্তি হাতে পেয়ে তিনি কিছু বলতেও পারছেন না। তিনি চেয়ারের নীচে এসে বসলেন। তারপর ধীরে ধীরে ছাত্রটিকে বললেন, 'তোমার এই কাজটা করা উচিত হয়নি। তোমার অন্যায় হয়েছে'।

ছাত্রটি তো বুঝতে পারেনি কি অন্যায় হয়েছে। সে মনে করেছে, ভাল কাজ করেছে।

ছাত্রটি বলছে, প্রভু, আমি বুঝতে পারছি না কি অন্যায় হয়েছে।

অধ্যাপক বলছেন, অন্যায় হয়েছে; তুমি এটা তৈরী করে আমাকে যশের দিকে নিয়ে যাচ্ছ। তুমি আমাকে তোমাদের চেয়ে আলাদা করে চিন্তা করছো। এটা করা উচিত হয়নি। এটাতো ঠিক না। ছাত্রটি ক্ষমা চাইলো, 'আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু।'

তুমি এটা তৈরী করে আমাকে যশের দিকে নিয়ে যাচ্ছ। তুমি আমাকে তোমাদের চেয়ে আলাদা করে চিন্তা করছো। এটা করা উচিত হয়নি। এটাতো ঠিক না।

অধ্যাপক বললেন, শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে তুমি সার্থক। তোমার হাত তৈরী হয়েছে। এখন থেকে তুমি সবাইকে নিয়েই মূর্ত্তি তৈরী করবে। গাছ-গাছড়া, পশুপক্ষী, জীবজন্তু, এদের নিয়ে মূর্ত্তি তৈরী করবে। ব্যক্তির মূর্ত্তি আর করবে না। আগেই বলেছি, ব্যক্তির মূর্ত্তি তৈরী করলে যশের দিকে চলে যাবে। আধিপত্য করার বুদ্ধি আসবে, নেতৃত্ব করার বুদ্ধি আসবে। সুতরাং তুমি ব্যক্তির মূর্ত্তি আর করবে না, এই নির্দেশ দিলাম। এই মূর্ত্তিটা সবার সামনে ভেঙে ফেলো।

—আজ্ঞে, আমি আমার হাতে ভাঙবো না, ছাত্রটি সবিনয়ে নিবেদন করে।

—না, তোমার হাত দিয়েই ভাঙতে হবে, অধ্যাপক আদেশ দেন। তুমি এটাকে চুরমার করো।

অতঃপর মূর্ত্তিটা ভেঙে চুরমার করে ফেলে দেওয়া হল।

অধ্যাপক আরও বললেন, মূর্ত্তির মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন আর নয়। তার মধ্য থেকে অহমিকা আসতে পারে। ব্যক্তির মূর্ত্তি করলেই ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার বুদ্ধি আসবে। তাহলে সমাজে সবাই এক হবে না, আলাদা হয়ে যাবে। বৈষম্য এসে যাবে। সেজন্য আমার মূর্ত্তি সবার সামনে ভাঙতে বাধ্য করলাম। তুমি যেটা করেছ, ভালবেসেই করেছ। কিন্তু এই ভালবাসা পরে আর থাকে না। তখন বৈষম্য এসে পড়বে। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা জাগবে। পরে তুমি আমার এই মূর্ত্তি ঘরে রাখতে চাইবে। বড় হলঘরে রাখতে চাইবে। তা আর করবে না। ব্যক্তির পূজা চলবে না। অধ্যাপক কঠোর হস্তে এই সামাজিক শিক্ষা দিলেন। নিজের মূর্ত্তি ভেঙে ফেলে কড়া শিক্ষা দিলেন। সবাইকে (ছাত্রদের) বললেন, তোমরা ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা করতে

যেও না। কারণ মূর্ত্তির মাধ্যমে ব্যক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলবে। তাঁকে স্মরণ করবে, পূজা করবে তাঁর কর্মের ভিতর দিয়ে। তাঁর কর্মকেই শ্রদ্ধা করবে। কর্মীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করবে না।

মূর্ত্তিটা ভাঙার সময়ে ছাত্রটি বলেছিল, তোমার মূর্ত্তি ভাঙছি। আমার মায়া হচ্ছে। কিন্তু মায়া হলেও বৃহৎ স্বার্থে সেটা মাথা পেতে নিলাম।

সবাই শিখলো, ব্যক্তির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। ব্যক্তির পূজা চলবে না। নির্দিষ্ট ব্যক্তির পূজা চলবে না। অধ্যাপক বললেন, এমনি তুমি পশুপক্ষী আঁক। সবাইকে দেখাও। হাতী, ঘোড়া, বাঘ এইসব আঁক। এগুলিকে কেউতো ব্যক্তির পূজা হিসাবে গ্রহণ করবে না। তুমি আমার মূর্ত্তি করতে গেলে কেন? একটা ছোট শিশুর মূর্ত্তি (করতা) করতে। একটা শ্রমিকের মূর্ত্তি করতা। সাধারণ কর্মীরা কাজ করছে, তাদের মূর্ত্তি করতা। বিশেষভাবে আমার মূর্ত্তি করতে গেলে কেন? তাহলে আমাকে Importance দেওয়া হচ্ছে। গুরুত্ব দিতে গেলেই বিভেদ সৃষ্টি হবে। আমি তো তোমার কাছে গুরুত্ব নিতে আসিনি।

ছাত্রটি বলেছিল, আজ্ঞে, আর করবো না।

—যাক্ এইটুকুনু ঠিক। তোমার হাতের কাজ ভাল হয়েছে। তুমি হাতের কাজ শিখেছ।

তখন ছাত্ররা দুঃখের ভিতর দিয়েও বললো, এই হলো আমাদের স্কুলের শিক্ষা। ব্যক্তির পূজা আর চলবে না। ব্যাপ্তির পূজা চলবে।

এরপর থেকে সেই ছাত্রটি গাছ-গাছড়া, পশুপাখী, বাচ্চা শিশু, বাঁকে করে জল নিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ, পাথর দিয়ে এসবের মূর্ত্তি তৈরী করতে আরম্ভ করলো।

সেই অধ্যাপক তার কয়েকদিন পরে একটা পাথরের ফলকে যতগুলি ছাত্র আছে, সব ছাত্রের মূর্ত্তি আঁকলেন। দুই ঘন্টা, আড়াই ঘন্টা লাগলো। তিনি সবার ছবি এঁকে বললেন, তোমার ছাত্রকর্মী। সব এক জায়গায় আছো, এক বোর্ডে আছ, এক প্ল্যাটফর্মে আছ। আমরা সবাই কর্মী।

অধ্যাপক শিক্ষা দিচ্ছেন, বড় হওয়ার জন্যই তোমরা জন্ম নিয়েছ।

তোমরা একেকটা এমন হীরক হবে, জুয়েল হবে, ভারতবর্ষ এমন বিরাট হবে, তোমাদের মনোবলে কেউ তোমাদের সঙ্গে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধি বলে, সাত্ত্বিক সত্য নিষ্ঠার সাধনায় সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি মরে যাবে। তাই তোমাদের পরাজয় তো কখনো হবে না।

কতবড় যে হবে, বলা যায় না। তার দৃষ্টান্ত ঐ যে সূর্য, কতবড় তোমাদের কাছে। কতবড় দেখতে পাচ্ছ। এই যে রাস্তা তৈরী করছো, সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় তো। একজন এতবড় রাস্তা তৈরী করতে পারে? লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রমদানেই তো গড়ে উঠেছে এতবড় রাস্তা। কত গাছ, কত সুন্দর, কত মধুময়। এই যে ঝরণার জল আসছে, প্রকৃতির এই যে মহাদান, কি মনোরম। তোমরা একেকটা এমন হীরক হবে, জুয়েল হবে, ভারতবর্ষ এমন বিরাট হবে, তোমাদের মনোবলে কেউ তোমাদের সঙ্গে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধি বলে, সাত্ত্বিক সত্য নিষ্ঠার সাধনায় সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি মরে যাবে। তাই তোমাদের পরাজয় তো কখনো হবে না।

—আজ্ঞে, আমরা তোমার মতো হতে পারবো তো? ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করে।

—এ কি বলছো? কোনদিন আর এই কথা উচ্চারণ করবে না। 'আমার মত' বলছো কেন? আমি কে? 'আমার মত' বলতে গেলে আমাকে উঁচু স্থান দেওয়া হচ্ছে। আমাকে ব্যক্তি হিসাবে বড় করছো। ভালবাস বলে অঙ্কে ভুল করবে না, অধ্যাপক বললেন।

—প্রভু, আমরা যখন মরে যাব, তখন তো কারও সাথে কারোর আত্মীয়তা থাকবে না। আর তো কেউ কাউকে দেখতে পাবো না।

অধ্যাপক বলছেন, যেটা প্রকৃতির নিয়ম, যেটা প্রকৃতির সৃষ্টি, তাই হবে। আলাদা করেই যদি মৃত্যু হয়, এটাই হবে সৃষ্টির নিয়মে। আবার যদি মিলনের খাতে রাখে, আবার মিলতি হবে। সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার তো দরকার নেই। তোমার কি জানা আছে যে, মৃত্যুর পরে মিলন হবে না? তবে একথা বলতে গেলে কেন? এই কথা কেন মনের মধ্যে আসবে?

ছাত্ররা বলে, আজ্ঞে, একথা আসে, এই চিন্তা আসে ভালবাসায়। তোমাকে ছেড়ে যাব, তোমাকে তো ভালবাসি, তাই চিন্তা আসে।

—না, না। স্মৃতিটা তো থাকবে, কর্মটা তো থাকবে। ওটাই তো

জীবন। ওটাই তো ভালবাসা। দুঃখ করবে না। ব্যথা পাবে না। প্রকৃতির মহাদানকে শ্রদ্ধা করতে শেখ। চিরকাল যদি ভারতবর্ষের মাটিতে তোমাদের মতন ছাত্র যাকে, তোমাদের মতন কর্মী থাকে, তবে ভারতবর্ষে কোনদিনই অভাব আসবে না।

তখন ছাত্ররা বলছে, আমাদের মতন কর্মী থাকলে কোনদিনই অশান্তি হবে না, তুমি বলছো। আবার তোমাদের মত অধ্যাপক থাকলেও কর্মীরা কোনদিনই বিপথগামী হবে না। বিপথে যাবে না। এরকম অধ্যাপক বিরল।

আবার অধ্যাপক বলছেন, আমার কাছে এরকম ছাত্রকর্মীরাও বিরল।

অধ্যাপক এবং ছাত্র উভয়ের মিলনের মাধ্যমে ভারতের বুক ঠান্ডা হবে, শান্তি হবে। দুইয়েরই অবদান আছে। কেউ কারও চেয়ে কম নয়।

তোমরা এখন চিন্তা করে দেখ, তখনকার যে শিক্ষাব্যবস্থা আর এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

—আজ্ঞে, দেখতে তো পাচ্ছি। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে অন্যরকম। আশীর্বাদ করবেন, আপনার এই আদিবেদের শিক্ষায় আমরা যেন আদিবেদের সমাজ তৈরী করতে পারি।

বিচক্ষণ ঋষিদের যেমন ধ্যানধারণা, আমার মনটাও ঐ ধরণের। বেদের শিক্ষা পদ্ধতির ধারায় এখনকার স্কুল, কলেজ যদি চালাতো, ঐভাবেই guide (গাইড) করতে পারতাম। অতটা না পারলেও কিছুটা পারতাম। অতটা লেখাপড়া শিক্ষা দিতে না পারলেও, তৈরী করতে পারতাম। বৈদিক স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করলে ক্যালিভারটা অনেক বেশী সুন্দর হতো। আমি একেবারে 'র' (আদি) থিকা নামছি তো? হঠাৎ একেবারে নাইমা (নেমে) হয় নাকি? চালু করলে কাজ ভাল হয়। আজ এই থাক। আগামীকাল বেদের যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

হে জগৎবাসী সময় চলে যাচ্ছে তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করো

সুখচর ধাম
১৭ই নভেম্বর, ১৯৮৩

বেদের সমাজটা যে দিয়েছি, তাতে কতরকম সুন্দর জিনিস আছে, বেদের সমাজটা যে দিয়েছি, তাতে কত কিছু আছে। এখন যে গল্প, তাতে দীনেশ এল, সুরুচি এল, রুচি রইল, সবিতা গেল। কবিতা এল। চা খেল, গল্প করলো। তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে গেল। ফ্যাক্টরীতে দেখা হ'ল, হাসপাতালে দেখা হ'ল। এই সমস্ত নচ্ছার গল্প তখন ছিল না। এখন মানুষকে এমনভাবে তৈরী করেছে যে, নিজের ভাইবোনকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু করেছে। সমাজ শিক্ষার ফল আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেদের যুগে ছিল সব কিছু পরিষ্কার, স্বচ্ছ পবিত্রতায় ভরা। সত্য ছাড়া মিথ্যা তারা জানতো না। একজন যদি মিথ্যা কথা বলতো, চরম শাস্তি দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। মিথ্যা কথা শুধু মুখে নয়, মনে মনেও মিথ্যার চিন্তা করতে পারবে না। এইভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা তখন ছিল।

বেদের যুগে সবাই ব্যাপ্তির চিন্তা নিয়ে চলতো। বেদের স্কুলে আচার্যরা তাদের পথ নির্দেশ দিতেন। বিজ্ঞ বিচক্ষণ আচার্যদের কথা অনুযায়ী তারা প্রকৃতির মহান্ কর্মীদের (আলো, বাতাস, জল, মাটি) মতো সমাজের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিল। তাদের সাহিত্য, কবিতাও ছিল প্রকৃতির আদর্শে গড়া। সেখানে হাল্কা রোমাঞ্চকর গল্প বা রসাল কাল্পনিক আখ্যানের স্থান ছিল না। এখনকার মতো কোন প্রেম কাহিনী তাদের সাহিত্যে স্থান পেত না। 'মিথ্যা' বলে কোন শব্দ তারা জানতো না। তাদের অভিধানে 'মিথ্যা'

শব্দটি ছিল না। একজন ছাত্র এই 'মিথ্যা' শব্দটি সম্বন্ধে তার সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করেছিল। এজন্য তার পেটে পাথর বেঁধে তাকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

ছেলে মেয়েদের মধ্যে কারুর প্রতি কারও দুর্বলতা সৃষ্টি হলে তারা স্বীকার করতো। যেমন, কোন ছেলের হয়তো কোন মেয়েকে দেখে ভাল লেগেছে। সে মেয়েটির কাছে গিয়ে বললো, 'আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আপনি কি আমার সাথে মিশতে রাজী আছেন?

মেয়েটি হয়তো বললো, 'না, আমি সেভাবে চিন্তা করিনি।'

—'ঠিক আছে। আপনার সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা এসেছিল। আপনি আমাকে মাপ করবেন।' ছেলেটি ক্ষমা চেয়ে নিল। ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল। এ নিয়ে তারা নিজেদের মনে কোন রাগ বা দুঃখ পোষণ করে রাখতো না। এমনকি কারও ওপরে রাগ বা অভিমান হলেও তারা সরাসরি গিয়ে স্বীকার করতো, মনের কথা খুলে বলতো।

ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়স হলে মা বাবা আচার্যদের সাথে পরামর্শ করে ছেলে বা মেয়ে ঠিক করতেন। মা বাবা যার সাথে বিবাহ দিতেন, তাকে নিয়েই তারা সুখে শান্তিতে ঘর করতো। এখনকার মতো প্রেম করে পালিয়ে গিয়ে অযথা সময় বা অর্থ নষ্ট করতো না।

বেদের যুগে 'আমার' বলে কোন জিনিস কারও ছিল না, সব আমাদের। ঘর, বাড়ী, মাটি সব আমাদের। রাস্তায় রাস্তায় ফলের গাছ, ফুলের বাগান সব আমাদের। নিজের বলে কিছু নেই। গোটা দেশটা ছিল এক একান্নবর্তী পরিবারের মতো।

প্রত্যেকে চাষবাস করবে। এটা ছিল বাধ্যতামূলক। প্রচুর খাবার ভাণ্ডারে জমা থাকতো। প্রত্যেকে যার যার যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুনু গ্রহণ

করতো। তার অতিরিক্ত এক মুঠোও কেউ গ্রহণ করতো না। সঞ্চয় করা ছিল নিষিদ্ধ। যাকে এখানে বলে মজুত করা, তা নিষিদ্ধ। সঞ্চয় করা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ, পরিষ্কার কথা। সঞ্চয় করলেই সমতার সুর থেকে, সাম্যনীতি থেকে সরে যাবে। সমাজ এককাত হয়ে যাবে। এককাত হলেই বিপদের ভয়। আজকে আমরা এককাত হয়ে আছি। কারণ শোষকগোষ্ঠী, অসুরগোষ্ঠী আমাদের এমনভাবে বিব্রত করছে, এমনভাবে শুষতে শুরু করেছে যে, সমাজকে একেবারে নিংড়িয়ে নিংড়িয়ে নিয়ে ছিবরেটুকু ফেলে দিচ্ছে মাত্র। আজ আমরা সেইভাবে নির্যাতিত। ঐ শোষকদের শোষণের, অত্যাচারের কিভাবে প্রতিকার করতে হবে, তখনকার সময়ে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। আজকে আমাদের উপরে সর্বদিকে অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন করে যাচ্ছে, প্রতিবাদ করার উপায় নাই। যে প্রতিবাদ করবে, সে হবে দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী। সে হবে দোষী। সে থাকবে থানায় পুলিশের হেফাজতে আটক। আর যে শয়তান সমাজের সকলের সামনে কাপড় ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যাচ্ছে, তার কোন প্রতিকার আমরা করছি না। তার ব্যবস্থা করছি না। এই কথাগুলি রাজনীতির কথা নয়; ধর্মের কথা।

ধর্মের কথা শুধু লক্ষ্মী নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণের বিরহ মিলনের বিবরণ নয়। শুধু মাহাত্ম্য আর পাঁচালী পড়াই ধর্মের কথা নয়। ভিত তৈরী করতে হলে মাটির নীচে অনেক কিছু দিতে হয়। তবে হবে বহুতল গৃহ, বহুতল প্রাসাদ। আজ সমাজে ভিতেই, ভিত তৈরীতেই গোলমাল। তখনকার সমাজে এইরকম মঠ, মন্দির ছিল না। এত বাবাজী, সাধু, ব্রহ্মচারী ছিল না। তখন ছিল পরিষ্কার নীতি। একে একে দুই, দুইয়ে দুইয়ে চার। এখনকার মতো দুইয়ে দুইয়ে সাত ছিল না। এখন Mathematics-এর (গণিতের) সাথে যুক্ততা নাই। কিন্তু অঙ্ক করছে। সেই অঙ্কে দুইয়ে দুইয়ে সাত, সাতে তিনে চৌদ্দ। অঙ্ক মিলিয়ে যাচ্ছে। ভুল যে বলবে, তার হবে গর্দান। চারিদিকে আগাছার মতো সৃষ্টি হয়েছে দল আর সম্প্রদায়। এই দল, সম্প্রদায় যতদিন সমাজের বুকে থাকবে,

ধর্মের কথা শুধু লক্ষ্মী নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণের বিরহ মিলনের বিবরণ নয়। শুধু মাহাত্ম্য আর পাঁচালী পড়াই ধর্মের কথা নয়। ভিত তৈরী করতে হলে মাটির নীচে অনেক কিছু দিতে হয়। তবে হবে বহুতল গৃহ, বহুতল প্রাসাদ।

ততদিন সমাজের উন্নতি হতে পারে না। তাই আমাদের কর্ত্তব্য কি, ধর্মে কি নির্দেশ দিচ্ছে? ধর্মে নির্দেশ দিচ্ছে যে, বেদের যুগে কি ছিল, সেটা জেনে নিয়ে বর্ত্তমান যুগের পরিস্থিতিতে, এখনকার পরিস্থিতিতে আমাদের কি করণীয়, তা ঠিক করতে হবে।

বেদজ্ঞরা বলেছেন, পুরোপুরি বাস্তবভিত্তিক কথা। এর আগে **একজন বেদজ্ঞ একটা কথা লিখেছেন দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে। খুব দুঃখ করে একজন বেদজ্ঞ বললেন, আমার জ্ঞান চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি, কয়েক হাজার বছর পরে এই ভারতবর্ষের বুকে এমন একশ্রেণীর শয়তানের সৃষ্টি হবে, যারা সমাজের বুকে এসে সমাজকে ভাগ করে দেবার চেষ্টা করবে।** আমাদের ধর্মে যাহা আমরা প্রমাণে আনতে না পারবো, তা সহজে মানবো না। আমরা তাহাই মানবো, যাহা প্রমাণে আসবে। প্রমাণ বিহীন কোন কথা আমরা কখনো বলবো না। কারও ধর্মকে আঘাত দেওয়া আমাদের নীতি নয়। ঐ বেদজ্ঞ ঋষির বলার পরে তাও প্রায় এখন থেকে ২৫ হাজার বছর আগে ভারতের বাহির থেকে বাবাজী ব্রহ্মচারী গদানন্দ সদানন্দ জটাধারীরা কেউ লেংটি পরে, কেউ উলঙ্গ হয়ে ভারতের সীমান্তে এসে No man's land-এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলেছেন। তারা কি বললেন?

কয়েক হাজার বছর পরে এই ভারতবর্ষের বুকে এমন একশ্রেণীর শয়তানের সৃষ্টি হবে, যারা সমাজের বুকে এসে সমাজকে ভাগ করে দেবার চেষ্টা করবে।

ভারতের দিকে তাকিয়ে তারা বললেন, হে ভারতবাসী, তোমরা অজ্ঞ, তোমরা মূর্খ। হে ভারতবাসী, তোমাদের মা, বাবা নাই বুঝি? সমস্ত ভারতবাসী হাঁ করে তাকিয়ে আছে, এরা কি বলছে? আমাদের মা বাবা নাই?

তারা বলছেন, যদি তোমাদের মা বাবা থেকে থাকে, তাদের মৃত্যু হয়েছে? তোমরা কি মনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো বলো? একি সন্তানের কর্ত্তব্য? যে মা বাবা চলে গেছেন, মায়ের বাবা চলে গেছেন, বাবার বাবা

চলে গেছেন, ভাই চলে গেছে, তাদের জন্য তোমরা কি করিতেছ? সারাদিন গাভীর মতো খাবার ব্যবস্থা করছো? গাভী যেমন সারাদিন ঘাসে মুখ লাগিয়ে চলে সকাল থিকা সন্ধ্যা অবধি, তোমরা তো তাই করছো। সারাদিন তোমরা চাষবাস, সমাজের শান্তির জন্য চেষ্টা করছো। এদের জন্য কোন ব্যবস্থা তো তোমরা করছো না। এই আত্মার কল্যাণ, আত্মার মুক্তি, কিছুই তো তোমরা করছো না। অপদার্থ তোমরা তোমাদের পিতা, পিতামহ, মাতা মাতামহ — তারা তোমাদের গায়ে থুথু ছিটাচ্ছে। সুতরাং তোমরা যাও। তোমাদের বেদজ্ঞদের কাছে গিয়ে বলো। তোমাদের আদিবেদ থেকে তাঁরা কি এই শিক্ষা দান করছেন? এই শিক্ষা দিচ্ছেন? সকালবেলা তোমাদের গলায় দড়ি দিয়ে মাঠে নেয়। ঐ সারাদিন শুধু খাওয়া খাওয়া খাওয়া। আর বিকালবেলা গোয়ালঘরে নিয়ে আটকায়। আর কি করছো? সারাদিনের খাওয়াটা গলায় নিয়ে গিয়ে শুধু চিবাচ্ছ, রোমন্থন করছো। এইতো তোমাদের কাম (কাজ)। তোমাদের বেদজ্ঞরা এই শিক্ষাই দিলেন। এখন বোঝ, নিজের গলায় খাবার নিয়ে এসে খাচ্ছ। আর ঘুম থেকে উঠে তোমাদের মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন। সারাদিন ঘাসে মুখ দিয়ে আছ। এই তো শিক্ষা। সব তো দেশবাসী শুনলো। সবাই গিয়ে বেদজ্ঞদের কাছে জানালো ঐসব জটাধারীদের সব কথা।

তখন বেদজ্ঞরা দেশবাসীকে জানালেন, ভাল কথা, তারা এইটা বলেছে। উত্তম কথা বলেছে, যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মা থেকে থাকেন। তারা সেটা প্রমাণ করতে পারবে কি না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ, যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের জীবিত কালীন অবস্থায় যদি সত্যিকারের সেবা না করে থাকি, নিশ্চয় আমাদের অপরাধ। কিন্তু কথা হল, তার আগে তো জানতে হবে যে, মৃত্যুর পরে আত্মা আছে। সেই সম্বন্ধেই আমরা যখন জানতে পাররাম না, তখন প্রমাণ বিহীন কোন কথা স্বীকার করতে পারছি না। সব বেদজ্ঞরা বললেন, আমরা স্বীকার করছি, আমরা এখনও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারিনি। মিথ্যা ছল চাতুরী দিয়ে এই মাটির বুকে আমরা মহান

আমাদের পূর্বপুরুষগণ, যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের জীবিত কালীন অবস্থায় যদি সত্যিকারের সেবা না করে থাকি, নিশ্চয় আমাদের অপরাধ।

অবতার সাজতে চাইছি না। যাহা সত্য, যাহা ন্যায় তাহাই আমার করবো। তাই সেই সব সাধু বাবা যাঁরা মহান, অবতার হয়ে, বাবাজী হয়ে, গদানন্দ, সদানন্দ হয়ে এসেছেন, তাঁদেরে জানাও আমাদের কথা।

দেশবাসী বললো, তাঁরা নাকি বেদজ্ঞদের সাথে দেখা করতে চাইছেন।

'ঠিক আছে। তাঁদেরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসো কড়া পাহাড়া দিয়ে। শুধু এইখানে নিয়ে এসো। অন্য কোথাও যেন ঐ বাণী প্রচার না করে', বেদজ্ঞরা জানালেন।

তখন তাঁদের নিয়ে আসা হলো ঐ বেদজ্ঞদের কাছে। ঐ সব জটাধারী — কোনটা লেংটিধারী, কোনটা উলঙ্গ, বিভিন্নরকমের চেহারা। কোনটা অর্ধপাগল, কোনটা আধা হাত কাপড় পরণে, নানারকমের বেশধারী। সেইসব বাবাজীরা বেদজ্ঞদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বেদজ্ঞরা তাঁদের শ্রদ্ধা জানালেন এবং বললেন, তোমরা কোন্ বাবা, কোন্ ব্রহ্মচারী, কোন্ সাধু, কোথাকার সাধু আমরা জানি না। মানুষ হিসাবে আমরা তোমাদের ভালবাসা জানাচ্ছি। তোমরা কোন্ দেশ থেকে, কোন্ বিদেশ থেকে এসেছ, তাও জানছি না। আমরা জানতে পেলাম, আমাদের জন্য তোমাদের খুব দরদ। আমাদের দুঃখে তোমরা দুঃখী। তোমাদের আন্তরিকতায় আমরা খুবই খুশী। কারণ আমরা জানলাম, আমাদের দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় ব্যথিত হয়, এমন ব্যক্তিও আছে। তাই তোমাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি। বল, তোমাদের জন্য আমাদের কিছু করণীয় আছে কি?

তাঁরা বলেন, তোমরা আত্মার সম্বন্ধে কিছুই বল না। দেবতারা যে আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে সমাজে কারও কাছে কিছুই বল না। তোমরা এই দিকটা কেন লুকিয়ে যাচ্ছ?

তখন বেদজ্ঞরা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে বললেন, বাবাজীরা যখন এসেছো আমাদের কাছে, তোমাদের জানাচ্ছি কয়েকটি কথা। প্রথমতঃ আমরা বলতে পারছি না দেবতা বা ভগবান আছেন। আমরা এখনও একথা বলতে পারছি না। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পরে যে আত্মা আছে, সে বিষয়ে আমরা এখনও পর্যন্ত অবগত হইনি। সুতরাং যাহা জানি না, যাহা বুঝি না, যাহা

দেখি নাই, সেই বিষয় নিয়ে কানকথা বা শোনা কথার উপরে নির্ভর করে কিছু বলতে চাই না। এই সুন্দর সমাজের সুব্যবস্থার মধ্যে আমরা এই কথা বলতে পারবো না। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে আমরা পারবো না। সুতরাং তোমরা যে হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে ভারতে এসেছ ভারতের জনগণের জন্য, তোমাদের কথা আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না। তোমাদের কথা আমরা গ্রহণ করবো যদি উপযুক্ত প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিতে পার। তবেই আমরা গ্রহণ করবো। তা না হলে আমরা গ্রহণ করতে পারবো না। তোমাদের মত ভগবান আছেন, আমরা বলবো না। আবার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করছি, একথাও আমরা বলবো না। আমরা বলবো, ভগবান থাকলেও থাকতে পারেন, তা আমরা জানি না। আত্মা থাকলেও থাকতে পারেন, তা আমরা জানি না। তবে আমাদের এই ভারতবাসীরা আমাদের শিক্ষায়, বেদের শিক্ষায় তারা এই কথাই বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণের মাধ্যমে আমরা জানতে না পারবো, বুঝতে না পারবো, আমাদের সেভাবে যতদিন পর্যন্ত অনুভূতি না আসবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের বুকে এই সমস্ত অযথা কথায় ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করা চলবে না। বেদজ্ঞরা এই কথা জানালেন ঐ সাধুবাবাদের।

তাঁরা আরও বললেন, সাধুবাবা, অত কথা বলার প্রয়োজনীয়তা নাই। সাধুবাবা এককথা বলো। আমাদের মা নাই, বাবা নাই, বাবার বাবা নাই। তাঁদের এনে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দাও। তাঁরা যদি আমাদের বলেন, 'আমরা দুঃখে কষ্টে আছি, একটা ব্যবস্থা কর', নিশ্চয়ই তোমাদের আদেশ নির্দেশ শিরোধার্য করে আমরা তাহা পালন করবো। ইহার আগে পর্যন্ত অযথা উক্তি করবে না। বল, সাধুবাবা বল। তোমার দেওয়া মত সম্পর্কে প্রমাণ কিছু আছে কিনা বল। তবে কেন তুমি এই কথাগুলো বললে? জানি, তুমি প্রমাণ দেখাতে পারবে না। এই কথাগুলো তুমি কোত্থেকে বললে যে, আত্মা আছে, দেবতা আছে, স্বর্গ আছে, শান্তি আছে। এই কথাগুলো তুমি কোত্থেকে পেলে জানিয়ে দিতে হবে।

তখন সাধুবাবা বললেন, পুরাণে কাহিনীতে আছে। সেই সুরে আছে এই কথা।

বেদজ্ঞরা গর্জে উঠলেন, সাধুবাবা, বন্ধ কর তোমার কথা। কোন কান কথার উপরে, কোন শাস্ত্রের কথার উপরে নির্ভর করে আমরা চলতে রাজী নই। প্রমাণ বিহীন সেই কথা কখনও আর কোনদিন আমাদের কাছে বলতে আসবে না। ভারতবর্ষের সীমান্তে এসে আর কখনও একথা বলবে না। যেদিন আসবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে আমাদের কাছে আসবে। সাধুবাবাদের হটিয়ে দিল সব।

কোন কান কথার উপরে, কোন শাস্ত্রের কথার উপরে নির্ভর করে আমরা চলতে রাজী নই।

এদিকে ভারতবর্ষের নানাদিক থেকে নানারকম অজুহাত, নানারকম প্রশ্ন আসছে। এই যে পৃথিবীর সৃষ্টি হলো, আমাদের কি করা উচিত? এই রকম সব প্রশ্ন অনেকের ভিতর জাগছে। তাঁরা সেই চিন্তায় সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন।

বেদজ্ঞরা বললেন, একশ্রেণীর বাবাজী সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে এসেছিল। যা দেখছি, আমরা আশা করি, আমাদের কথা হতে বাধ্য, আজ থেকে দশ, পনের, বিশ হাজার বছর পরে এই ধরণের এক শ্রেণীর সাধুরাই এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করবে যে, ভারতবর্ষের বুকে সাধুগুরু একেবারে রিফিউজির মতো সৃষ্টি হবে। এত হাজার হাজার আসবে যে, সমাজকে একেবারে রসাতলে ডুবিয়ে দেবে।

তাইতো দেখতে পাচ্ছি। রাস্তায় ঘাটে পাথরে এমন ভগবান সৃষ্টি করে ফেলছি যে, একেবারে ভরে, দশায় নানাদিক থেকে নানা ধর্মের সৃষ্টি হচ্ছে। মুসলমানরা দেখাতে পারলো না আল্লাহ্তাল্লা। হিন্দুরা দেখাতে পারলো না ভগবান আর খৃষ্টানরা দেখাতে পারলো না god, কিন্তু তাঁরা আচারে আচরণে ব্যবহারে এমনই ভাব দেখাতে লাগলো যে, তাঁদের আল্লা মসজিদে বসে আছেন, আমাদের ভগবান মন্দিরে বসে আছেন, আর তাঁদের god গীর্জায় বসে আছেন। মাঝখানে সব ফাঁকা আওয়াজ। কিচ্ছু নাই। কিন্তু লাগলো তার ফলেই গোলমাল। এই গোলমালের ফলে হিন্দু মুসলমান ভাগ হ'ল, বিবাদ হ'ল, বিচ্ছেদ হলো। আমাদের সোনার বাংলা, সোনার ভারতবর্ষ

টুকরো হয়ে গেল। আর আমরা মৃত্যুকে বরণ করে ফিরে এলাম। এই এখানকার বিভ্রান্তকারীদের বিবাদের ফলে দুর্ভোগ ভোগ করছি আমরা। জাহাজ তো চলে গেল। তার ঢেউয়ে পাড় ভাঙছে আমাদের। এই সমস্ত সংস্কারগত অবস্থা, সংস্কারগত নীতি আজও আমরা বহন করে চলেছি। কারণ কোন নীতির উপরেই আস্থা নাই। দিনের পর দিন এই নির্যাতন, এই দুর্দশা এই অভাব-অভিযোগ ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের। সব থেকে বঞ্চিত আমার সন্তানেরা। এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা শুষছে। শুষতে শুষতে আমাদের নিঃশেষ করছে। কোথায় তার প্রতিকার? কোন প্রতিকার নাই।

আমরা রাজনীতির দিক থেকে কোন কথা বলছি না। কোন ধর্মনীতির দিক থেকে কিছু বলছি না। আমরা বলছি বেদ নীতির থেকে কথা। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, বিচার ও গাণিতিক দিক থেকে আমরা কথা বলছি। এটাই ধর্ম। যারা আমাদের এই দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে, যারা তিলে তিলে আমাদের খুনের পথে নিয়ে চলেছে, যারা তিলে তিলে আমাদের দগ্ধ করছে, আমাদের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নিচ্ছে, মা বোনেদের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নিচ্ছে, যারা আমাদের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করছে, খাদ্য শস্য থেকে বঞ্চিত করছে, আমাদের উপযুক্ত প্রাপ্য থেকে যারা দূরে সরিয়ে রেখেছে, সাম্যনীতি থেকে যারা আমাদের অনেক দূরে রেখেছে, আমরা চাই তার প্রতিকার। খুনীর সাথে হাত মিলালে চলবে না। অপরাধীদের সাথে মুলাকাৎ করলে চলবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা উচিত। বেদ সেখানে এই শিক্ষাই দিয়েছেন, 'তোমরা যদি প্রতিকার না কর, প্রতিবিধান না কর, নিজেরা যদি দল, সম্প্রদায় সৃষ্টি করে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীকেই বাড়াতে চাও, তবে তোমরা অপরাধ করবে। তাই সমস্ত শয়তান, যারা সমাজের বুকে দুর্নীতির বাসা তৈরী করছে, আমাদের তিলে তিলে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করছে, তাদের যেভাবে পার সমাজ থেকে বিতাড়িত কর, অপসারিত কর'। এটাই ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ।

কোথায়? আমরা তাতো কিছু করছি না। আমার তিন কোটির উপরে সন্তান। সমস্ত বিভাগের পকেটমার থেকে শুরু করে সবরকম লোকই আমার কাছে আসে। আজও বাংলা ভারতবর্ষের বুকে কোটি কোটি মণ চাল, চালের

বাংলা ভারতবর্ষের বুকে কোটি কোটি মণ চাল, চালের বস্তা রয়েছে। সেই বস্তার উপরে আমের আঁটি ফেলে গাছ হয়ে গেছে। পচে যাচ্ছে। তবু ছাড়ছে না। কতবড় শয়তান এরা। এইসব শোষক, অসুরদের গলা টিপে ধরা দরকার।

বস্তা রয়েছে। সেই বস্তার উপরে আমের আঁটি ফেলে গাছ হয়ে গেছে। পচে যাচ্ছে। তবু ছাড়ছে না। কতবড় শয়তান এরা। এইসব শোষক, অসুরদের গলা টিপে ধরা দরকার। এরা বাজারে ছাড়ছে না। আমাদের মেরে ফেলার জন্য এরা এইসব করে যাচ্ছে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, আজও কোটি কোটি, কোটি কোটি মণ চাল, বস্তা বস্তা চাল লুকিয়ে রেখেছে মাটির তলার ঘরে। কেউ তা জানে না। জানলেও তারা মাথা চাড়া দিয়ে কোন প্রকার প্রতিকারে নামছে না। কারণ দক্ষিণা পাচ্ছে। সুতরাং চাই প্রতিবিধান, চাই প্রতিকার। এখানে এরকম চলতে দেওয়া হবে না।

আমি এখানে ঠাকুর (জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) বনতে আসিনি, ভগবান বনতে (সাজতে) আসিনি। আমি মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ রক্ত। অনেক অপবাদ লাঞ্ছনা, গঞ্জনার ভিতর দিয়ে আমি আমার পথ তৈরী করে চলেছি। আমি ৫ বছর ৩ মাস বয়স থেকে দীক্ষাদান করছি। তার জন্যই 'বালক ঠাকুর' 'বালক ব্রহ্মচারী' আমার নাম। বালক এখন নেই। কিন্তু আজও 'বালক' বলে। কারণ সেদিনকার বালকের কথা স্মরণ করেই আজও 'বালক' বলে। বাবার দেওয়া নাম খোকা। ছেলে বড় হলেও বাবা যদি জীবিত থাকেন, তাকে 'খোকা' বলেই ডাকেন। সেইরকমই আমার 'বালক' নাম। সমাজের এই অবস্থার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে যে কেউ নামবে, ইচ্ছা থাকলেও কেউ নামতে পারছে না।

কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি? প্রতিজ্ঞা? সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে পাঠশালার শিক্ষক, স্কুলের শিক্ষক, কলেজের শিক্ষক সবাই দীক্ষা নিয়েছে আমার কাছে। আমি তাঁদের প্রণাম করি। তাঁরা আমাকে প্রণাম করেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সেই পাঁচবছর বয়স থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সন্তানকে দীক্ষা দিয়ে চলেছি। আজ তিন কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। দীক্ষা নিতে টাকাকড়ি, কোন কিছুই লাগে না। ধর্মের দোহাই দিয়ে পয়সা রোজগার

ধর্মের নামে শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ, যাগযজ্ঞ করে, মানুষকে বিভ্রান্ত করে যারা টাকাকড়ি, অর্থ সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তারা হ'ল সমাজের পরগাছা স্বরূপ। সেই পরগাছাগুলো গাছের রস টেনে খায়। ঐ পরগাছাগুলোকে যেভাবেই হোক কেটে বাদ দিতে হবে।

করা আমার ধর্ম নয়। আমি ঘৃণা বোধ করি। ধর্মের নামে শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ, যাগযজ্ঞ করে, মানুষকে বিভ্রান্ত করে যারা টাকাকড়ি, অর্থ সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তারা হ'ল সমাজের পরগাছা স্বরূপ। সেই পরগাছাগুলো গাছের রস টেনে খায়। ঐ পরগাছাগুলোকে যেভাবেই হোক কেটে বাদ দিতে হবে। তা না হলে উপায় নাই। আগাছা আর পরগাছা রাখতে দেওয়া হবে না। তাই আজ দীক্ষায় দক্ষিণা নেওয়া হয় না। অর্থও নয়, বস্ত্রও নয়, কোন দক্ষিণাই চাওয়া হয় না। কিন্তু এই তিন কোটির উপরে সন্তান কেন করলাম? তাদেরে seal দিয়ে কেন রাখলাম? আমার গুরুগিরির জমিদারী বাড়াবার জন্য? তা তো নয়। তাদের কাছে দক্ষিণা আমি ঠিকই চাইবো। দক্ষিণা যখন চাইবো, তখন বুঝবে, সেই দক্ষিণা অর্থ বস্ত্র নয়। যেইভাবেই হোক, যত ধনীই হোক, ঘরে ডাকাত পড়লে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পূজা করলে চলবে না। তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে। আজ সমাজের বুকে চলছে এই অত্যাচার, অবিচার। ঘরে দানবগোষ্ঠী ঢুকে পড়েছে। আমার তিন কোটি সন্তান নিয়ে আমরা মাঠে নামবো। শয়তানদের সাথে মোকাবিলা করতে চাই। পরিষ্কার কথা। তখন চাইবো দক্ষিণা।

আমার দক্ষিণা তোমাদের দিতে হবে। সেই দক্ষিণা অর্থ-কড়ি নয়। সেই দক্ষিণা হ'ল খুনীর রক্ত নিয়ে তাদের বার করে দাও। এটা তো রাজদ্রোহ নয়, বাঁচার তাগিদ। সরকারকে আমি জানিয়েছিলাম, তোমরা যদি অনুপযুক্ত হয়ে থাক, যদি দেশশাসন করতে না পার, আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। আমরা তোমাদের গদী চাই না। আমাদের তিনমাসের কনট্রাক্ট (contract) দিয়ে দাও। ভারতবর্ষের সব শয়তানগুলিকে আগাছা পরগাছার মত উপড়িয়ে ফেলে দেব। এটা আমার অহঙ্কারের কথা নয়, অহঙ্কারের কথা নয়। এটা সহজ সরল জীবনের কথা, বাঁচার কথা। আমি গদী চাই না। রাজনীতি করতে চাই না। খুন আমার ধর্ম নয়। তবে খুন করতে এলে তাদের আমি ছাড়বো না। এটা ধর্মের কথা। তুমি যদি মুক্তি পেতে চাও, সমাজকে ক্লেদ মুক্ত করো। ক্লেদ থেকে সবাইকে মুক্ত কর। তাই সমাজকে

মুক্ত করতে পারলেই হবে মুক্তি। মুক্তি আর কোথায়? তোমরা তো স্বর্গ-নরক চেনো না। দেখনি দেবতার আশ্রম। দেখনি এই সমস্ত দেবদেবতার আস্তানা। কিছুই তোমরা জান না।

কিন্তু বেদ কি বলেছেন? শিব একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ত্রিশূল হাতে নিয়ে লিখলেন, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রার। তিনি বুকে লিখলেন, হে জগৎবাসী সময় তো চলে যাচ্ছে। তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করো। তাই অঙ্গে অঙ্গে সর্ব অঙ্গে তিলকের ব্যবস্থা। চক্রে চক্রে সাবধানতার বাণী অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। বিশুদ্ধ চক্রে এই যে কণ্ঠীর মালা, সাবধান। মিথ্যার মায়াজালে বাক্যকে দূষিত করো না। আজ্ঞাচক্রে তিলক, সাবধান। এই চক্ষু দিয়ে কুরুচিপূর্ণ কিছু দেখবে না। দিগ্‌দৃষ্টি ঠিক রেখো। গলায় তিলক, শ্বাসনালী আর খাদ্যনালী ঠিক রেখো। অযথা বাক্যব্যয় করো না। অনাহতে (বক্ষে) তিলক দেয় তো। সাবধান, CAUTION, সাবধান। মনোবল ঠিক রেখো। বাহুতে তিলক দেয়। বাহুবলও ঠিক রেখো। অযথা কাজে বাহুকে ব্যবহার করবে না। দেশের দশের কাজে বাহুকে ব্যবহার করবে। তাই তোমরা একত্রিত হয়ে নিষ্ঠা সহকারে সংযত চিত্তে এই আজ্ঞাচক্রে মনোনিবেশ করো। এই আজ্ঞাচক্র যাহা ঘুমন্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তোমরা দুই চক্ষু মুদ্রিত করে সেই সুরে সুর দিয়ে অনন্ত সুরের ধারাবাহিকতার ধারায় এগিয়ে চলো। তবেই খুঁজে পাবে তোমাদের সেই অন্তর্নিহিত সুর, যে সুর জানলে সব সুর জানা যায়। তোমরা তারই পথিক, তারই যাত্রিক।

হে জগৎবাসী সময় তো চলে যাচ্ছে। তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করো।

—হে পথিক, হে যাত্রিক তোমরা এইভাবে চলছো কোন্ আশায় কোন্ ভরসায়?

—আমরা জানি না। আমরা চলেছি স্পুটনিকের মত এই শূন্য মার্গে, যার সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই সীমাহীনের দৃষ্টিতে দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, সবাই যাচ্ছে।

—কিসের আশায় যাচ্ছ পথিক?

—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবাই যখন যাচ্ছে, আমরাও যচ্ছি।

—কোন্ আশায় যাচ্ছ?

—বলতে পারছি না, কি পাব আর কি পাবো না। তবে বেদজ্ঞরা বলে দিয়েছেন, 'তোমাদের সাধনা সুরের পথ, জানার পথ।'

আমরা এই দেহবীণাযন্ত্রে সুর বাজিয়ে বাজিয়ে অনন্ত বিশ্বের ধারাবাহিকতার ধারায় এগিয়ে যাচ্ছি। খুঁজে বার করতে চাইছি সেই জানার সুর। যদি থাকে, তবে সেই সুরেই ধরা পড়বে। যদি না থাকে তবে সুরে ধরা পড়বে না। তাই অযথা কারও কথার উপরে নির্ভর করে যদি বিশ্বাসে পরিণত না করি, অযথা কাউকে গালিগালাজ না করি, কাউকে অবজ্ঞা না করি, তবে কেন পাবো না? সেই দীক্ষাই যখন দিয়েছেন, এই দেহবীণাযন্ত্র বাজাতে বাজাতে চলেছি এই মহাকাশের পথে। তবে তার আগে প্রকৃতির নিয়ম আমরা মানছি। সেই নিয়মের পথে সমাজকে শাসন করতে হবে।

আমরা আমাদের মধ্যে কোন ক্লেদ পঙ্কিলতা রাখি না। মনের মধ্যে ছল-চাতুরী, মিথ্যার বাসা বাঁধতে দেই না, যাহা আজ বাসা বেঁধে আছে।

আমরা চাই সুন্দরভাবে বেদের ধারায় বেদের সমাজ গড়ে উঠুক। ভারতবর্ষের সব ভাইবোনেরা যদি সজাগ হয়ে দুটো খেয়ে পরে বাঁচার জন্য তাদের দাবী জানিয়ে তাদের প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নিতে পারে, তবেই তো যথেষ্ট। আজ সাধারণ মানুষেরা সমস্ত প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত। সাম্যের ধারাই হ'ল জনগণের প্রয়োজনের ধারা। বৈদিক যুগে এটাই ছিল নীতি। বেদের সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে বৈদিক বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা আনবো দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা।

আজ সাম্যের নীতি কোথায়? সাম্যের সুর কোথায়? তখনকার সময়ে সমাজে কেউ কাউকে অবজ্ঞা করতো না। যে ঝাড়ু দিত, তার যা মূল্য, যে কলম চালাতো, তারও একই মূল্য। আজকে আমরা কোথায় নেমেছি, চিন্তা করে দেখ। তাই বেদ বলেছেন, তোমরা এগিয়ে চল পথিক। মৃত্যু যখন আছে, এর থেকে যখন রেহাই পাচ্ছ না, মৃত্যুকে যখন কেউ রোধ করতে পারছো না, তখন মৃত্যুকে সম্বল করে তোমরা যতটুকুনু সময় এই পৃথিবীতে থাক, ততটুকুনু সময়

মৃত্যু যখন আছে, এর থেকে যখন রেহাই পাচ্ছ না, মৃত্যুকে যখন কেউ রোধ করতে পারছো না, তখন মৃত্যুকে সম্বল করে তোমরা যতটুকুনু সময় এই পৃথিবীতে থাক, ততটুকুনু সময় শান্তি মতন যাতে থাকতে পার, তার ব্যবস্থা কর।

শান্তি মতন যাতে থাকতে পার, তার ব্যবস্থা কর। এখানে কোন জিনিস, কেউ গ্রহণ করতে আসনি, ভোগ করতে আসনি। সবই যখন শেষ হয়ে যাবে, কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারছো না, ধরে রাখতে পারবে না, এটা তো জান। এটা ভাবের বা উচ্ছ্বাসের কথা নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তবের কথা। ধ্রুবতারা যেমন দিগভ্রান্তদের দিগ্ নির্দেশ করে দেয়, তেমনি মৃত্যু হচ্ছে আমাদের ধ্রুবতারা; আমাদের জীবনের চলার পথ। সেই মতেই আমরা এগিয়ে যাব।

সমাজে দুর্নীতির বাসা বাঁধতে দেওয়া হবে না। শোষকদের প্রতিপত্তি করতে দেওয়া হবে না। এই সমাজের বুকে যারাই দুর্নীতির বাসা বাঁধবে, সেই বাসা ভেঙে দেওয়া হবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে দুর্নীতি রোধ করি। এখানকার রাজনীতি, ধর্মনীতি নিয়ে কারও কোন বক্তব্য নাই। আমরা ভাইবোনেরা একই চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস, জল, মাটিতে বসবাস করছি। আমরা সবাই একই পৃথিবী মায়ের গর্ভজাত সন্তান। একই জায়গায় আমাদের শ্বাস পড়ছে, আমরা একই ঘাটের জলপান করছি। আসুন, আমরা একাত্ম হয়ে সমাজের ক্লেদগুলোকে কিভাবে বের করতে হবে, তার ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করি। আস ভাইবোনেরা এই মিলনের গীতি, মিলনের সুরের সাধনা করি। সমালোচনা করা সহজ, নিন্দা করা সহজ। সেই বাচ্চা বয়স থেকে আজ তিন কোটি সন্তান করেছি পরিশ্রমের মাধ্যমে। হে পথিক, হে যাত্রিক অনেক অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে এই ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছি। এটা আমার অহঙ্কারের কথা নয়। আমার সহজ সরল মনের কথা, সহজ সরল মনের উক্তি। তাই তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, আমি চাই তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজের অন্যায়ের প্রতিকার করতে। আমি এখানে ভগবান বনতে আসিনি। আমি সাধারণ হয়ে অতি সাধারণ সুরের সাথে অসাধারণ সুরকে বাজিয়ে সবাইকে এক করতে চাই। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমাদের নেতাজী আমাদের কাছে জীবিত

সুখচর ধাম
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮৬

আস্তে কেউ কথা বলবে না। আদিবেদের কয়েকটি কথা বলবো। নেতাজী সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু জানে। বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই। নেতাজী বেদের পূজারী ছিলেন, সত্যের পূজারী ছিলেন।

১৯৩৯ সালে ঢাকা সদরঘাটে বিরাট মীটিং হয়েছিল। সেই মীটিং-এ আমি ছিলাম। নেতাজীকে শুধু একটি কথাই বলেছি। ভারতবর্ষে ৩৩ কোটি লোক। আমি অন্য কিছু বুঝি না। আমার কাকাকে দেখেছি, তিনি স্কুল শিক্ষক ছিলেন। আরও ৭০/৮০ জন সহকর্মীকে নিয়ে স্কুলের মাঠে শুয়ে আছেন। তখন আমার অল্প বয়স। কাকাকে বললাম, কেন শুয়ে আছ? তোমার মাটি, তোমার দেশ, তোমার সব কিছু। তুমি কেন শুয়ে আছ কাকা? পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য? এতে লজ্জা হওয়া উচিত। তোমার কি হয়েছে? তুমি যে শুয়ে আছো?

তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, গ্রহ ..... গ্রহ (সত্যাগ্রহ)। তখন অল্প বয়স বুঝতে পারিনি। বললাম, তোমাকে কোন্ গ্রহে ধরেছে কাকা? গ্রহ গ্রহ বলছো কেন? সামনে বাঁশ ঝোঁপ দেখতে পাচ্ছ? ৮০টা বাঁশ নিয়ে ৮০জন ইংরেজের মাথায় বাড়ি দাও। সেটা করলে গ্রহ কেটে যাবে। কোন গ্রহ থাকবে না।

আস্তে। কেউ কথা বলবে না। সেই কথাটা আমি নেতাজীকে এসে বলেছি কয়েক বছর পরে। নেতাজীর মীটিং-এ গিয়েছিলাম। তারপর বলেছি বোস, এমনিতে কাজ হবে না। ভারতবর্ষে ৩৩ কোটি লোক। এই ৩৩ কোটি লোকের হাতে লাঠি ধরাও। ৩৩ কোটির মধ্যে ২০ লক্ষ লোক প্রাণ দেবে। ইংরেজগুলোকে তাড়াও। আমাদের বুটের তলায় রেখেছে ওরা। সুতরাং লাঠিই যথেষ্ট। অন্য কোন কিছু লাগবে না। ৩৩ কোটি লোক যদি ক্ষিপ্ত

হয়ে ওঠে, তবে কি না করতে পারে? সেই উপদেশ তুমি দাও। তোমাদের উপর আমরা বিশ্বাস আছে। তুমি চেষ্টা করলে করতে পার। এই সব সত্যাগ্রহ করে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমাদের দুর্বল বানাবার কোন প্রয়োজনই নেই। সেদিন নেতাজীকে এই সব কথা বলেছি। নেতাজী বললেন, আমাদের সেনাবাহিনী তৈরী করুন। সেই সময় বলতো, এখনও বলে, ধর্ম আর রাজনীতিকে এক করা চলবে না। এটা এখনও বলছে।

ধর্ম কি আলাদা? রাজনীতির মধ্যে কি ধর্ম নেই? ভাল করাটাই ধর্ম। একজন একজনকে উপকার করাটা ধর্ম। সেবা করাটা ধর্ম। আদিবেদে একথাই বলা হয়েছে। যেখানে ন্যায়, যেখানে যুক্তি সেটাই ধর্ম। যেখানে বিজ্ঞান যেখানে গণিত সেটাই ধর্ম। ধর্মকে আলাদা করে দেবার কোন অর্থই হয় না। মানুষের অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে যদি সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রাম কি ধর্ম ছাড়া? যদি বিপ্লব করে, আত্মরক্ষার বিপ্লব, সেটা কি ধর্ম ছাড়া? ধর্মে বিপ্লব আছে, ধর্মে সংগ্রাম আছে, ধর্মে আত্মরক্ষার সংগ্রাম আছে। বাঁচার সংগ্রাম আছে, বাঁচানোর সংগ্রাম আছে। আজকে দেশের এই পরিস্থিতি কেন? ৬/৭/৮ হাজার বছরের ধর্ম আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? ধর্ম গল্প নয়, ধর্ম কল্পনা নয়, ধর্ম ভাব নয়, ধর্ম উচ্ছ্বাস নয়। ধর্ম যুক্তিতে, ধর্ম বিজ্ঞানে, ধর্ম গণিতে। সেটাই হবে ধর্ম। ধর্ম নিয়ে বোসের (নেতাজীর) সাথে আমার ঘন্টা দেড়েক আলাপ হয়েছে।

মানুষের অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে যদি সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রাম কি ধর্ম ছাড়া? যদি বিপ্লব করে, আত্মরক্ষার বিপ্লব, সেটা কি ধর্ম ছাড়া? ধর্মে বিপ্লব আছে, ধর্মে সংগ্রাম আছে, ধর্মে আত্মরক্ষার সংগ্রাম আছে। বাঁচার সংগ্রাম আছে, বাঁচানোর সংগ্রাম আছে।

আজ সবাই নেতাজীকে চায়, নেতাজী ফিরে আসুক চায়। আমি নেতাজী সম্পর্কে বহুবার বহু জায়গায় বলেছি। তদন্ত কমিশনে আমাকে সাক্ষী মেনেছিলেন। সেই সাক্ষীতে শুধু একটি কথাই বলেছি, আমি যাকে নেতাজী বলে মনে করি, তাকে আনা হোক গড়ের মাঠে। তিনি নেতাজী কি না প্রমাণ হয়ে যাবে। এই কথা বলেছিলাম। কিন্তু প্রমাণ হলে তার উপরে যেসব আইন টাইন আছে, সেই আইন কানুন নষ্ট করতে হবে, সেই আইনগুলি পুড়িয়ে দিতে হবে। তারপর তদন্ত কমিটি পরদিনই দিল্লী হাওয়া। দিল্লী চলে গেল।

আমার শিষ্য ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। তার মারফৎ জরহলাল নেহরু আমাকে নেমন্তন্ন করে পাঠালেন। গেলাম প্রাইম মিনিষ্টারের (প্রধানমন্ত্রীর) বাড়ীতে। আমাকে রেখেছিল শাহনওয়াজ খানের বাড়ীতে। ১৫/২০ দিন শাহনওয়াজের বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে তিনদিন জরহলাল নেহরুর নেমন্তন্নে এসেছিলাম। তিনি নিজ হাতে যত্ন করে খাইয়েছেন। দুইদিন চলে গেল। কেন নেমন্তন্ন করলেন, কিছুই জানলাম না। রাজনীতির কোন কিছুর সঙ্গেই আমার যোগাযোগ নাই। নিজহাতে ফুটি কেটে আমাকে খাওয়াচ্ছেন। আমি কারণ বুঝতে পারছি না। তিনদিনের দিন বললেন, গুরুজী, এক বাত হ্যয়।

আমার কাছে ৫টা কাগজ ছিল। তিনটা কাগজ সরে গেছে। এই কালি (Ink) প্রমাণ করা হয়েছে। সই genuine, প্রমাণ হয়েছে। কালিটা 1962-63-এর সই করা কাগজ। সুতরাং নেতাজী যে Plain accident-এ মারা যাননি, এইটা একেবারে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

—ক্যা বাত হ্যয়?

—নেতাজীকা বাত হ্যয়।

—এতক্ষণে নেমন্তন্ন বুঝতা হ্যয়। ব্যাপারটা বুঝলাম।

নেহরু বললেন যে, নেতাজীর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে শুনেছি। রিপোর্ট আছে। নেতাজী কোথায়? কি ব্যাপার? তিনি কিভাবে কোথায় আছেন? তোমার কাছে সাদা কাগজে নেতাজীর সই করা কাগজ আছে।

আমি বললাম পণ্ডিতজী, তোমাকে যদি বিশ্বাস করে কেউ কিছু বলে, সেটা কি সবার কাছে flash করা উচিত? এই blank paper-এ নেতাজীর সই করা কাগজ আমার কাছে আছে। আমার কাছে ৫টা কাগজ ছিল। তিনটা কাগজ সরে গেছে। এই কালি (Ink) প্রমাণ করা হয়েছে। সই genuine, প্রমাণ হয়েছে। কালিটা 1962-63-এর সই করা কাগজ। সুতরাং নেতাজী যে Plain accident-এ মারা যাননি, এইটা একেবারে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

সুতরাং এইটা প্রমাণ করা হোক, কালি প্রমাণ করা হোক। আমি challenge করছি, এটা নেতাজীর সই, সবাই স্বীকার করবে। তিনি কি আসামী যে পালিয়ে বেড়াবেন?

আমার কাছে মেজর সত্যগুপ্ত, মালহোত্র, হেমন্তবাবু, নেতাজীর যত অনুগত সবাই এসেছেন। সবার সাথে আমি কথা বলেছি। তখন বেশ কয়েকবছর হয়ে গেছে। আমি একটি কথাই বলেছি, যেই নেতাজীকে আমি চিনি, যেই নেতাজীকে আমি, দেখেছি, যেই নেতাজীকে জানি, সে এখনও পর্যন্ত আছে বলে মনে করি। কিন্তু আমি খোলাখুলি বলিনি, নেতাজী আছেন। তার কারণ আমার পিছনে অনেকে লেগেছে, যাতে আমি এই কথাটা না বলি।

নেতাজীর মেয়ে বলে যাকে বলে, 'অনিতা' আমার কাছে এসে উপস্থিত, 'আমি যে নেতাজীর মেয়ে আপনি বলুন।'

—আমি একথা বলতে পারবো না।

সে চলে গেছে। আমাকে নেতাজীর বাড়ীতে নিয়ে গেছে। সুরেশ বোস, সুরেশ বোসের স্ত্রী, নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন বোস। সবাই এসেছে নেতাজীর সভায়।

আমি একজনকে নাগাল্যাণ্ডে পাঠালাম। সে নাগাল্যাণ্ডে গেল। তারপর তাকে চোখ বেঁধে জিপ গাড়ী করে নিয়ে যাওয়া হ'ল এক জায়গায়। চোখ খুলে দিল। খালি একটা ঘর। কয়েকখানা চেয়ার পাতা। আর কোন কিছু নেই। হঠাৎ খাবার দিয়ে গেল, খেল। খাবার পরে মশলা মুখ শুদ্ধি হাতে করে এনে দিল। খেয়েই চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে। বার্মাতে যখন আমি নেতাজীর সঙ্গে ছিলাম, ঐ ভদ্রলোক বলছে, খাবার পরে নেতাজী এই মশলা আমাকে দিতেন। এই গন্ধ, এই মশলা এই টুকুই দিতেন। সে চিৎকার করছে, নেতাজী নিশ্চয়ই এখানে আছেন। নেতাজী ছাড়া এই মশলা আর কেউ জানে না। আমাকে খাবার পরে এই মশলা দিতেন, বার্মাতে যখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম।

মেজর সত্যগুপ্ত আমাকে বলেছে, আপনি জানেন নেতাজী কোথায় আছেন?

আমি বলি, তোমরা কি বল? কি বলতে চাও? নেতাজী যদি

আত্মগোপন করে থাকেন, তিনি যদি আমাকে বলে থাকেন, অমি যদি জেনে থাকি, সবটাই 'যদি', তবে আমার কি সেই গোপন কথাটা ফাঁস করে দেওয়া উচিত? বল?

—আজ্ঞে না।

সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যতটা আমি জানি, যতটা মিশেছি, যতটা বুঝেছি, আমার কাছে যদি blank paper-এ সই করা কাগজ দিতে পারে, এটাই যথেষ্ট। এটার মধ্যে আমি অনেক কিছু লিখিয়ে নিতে পারি, মনে রেখো। কিন্তু আমি তো লেখাইনি। কালকেই দেখিয়েছি। যে বিশ্বাস করে দিয়েছে, তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা আমাকে রাখতেই হবে। এতটা বয়স হয়েছে। অমর হয়ে কেউ আসেননি। তবে আমাদের কাছে তিনি (নেতাজী) অমর। তাঁর যশ, তাঁর দেশপ্রীতি, তাঁর দেশপ্রেম যথেষ্ট। তাঁর সাথে বেদ সম্পর্কে কথা বলেছি আধঘন্টা। তিনি বসে বসে শুনলেন। আমি বলেছি, আমার দেশের বেদ প্রকৃতির সুরে গাঁথা, প্রকৃতিগত, প্রকৃতির ধারাপাতা। বেদ কেউ লেখেনি।

এতটা বয়স হয়েছে। অমর হয়ে কেউ আসেননি। তবে আমাদের কাছে তিনি (নেতাজী) অমর। তাঁর যশ, তাঁর দেশপ্রীতি, তাঁর দেশপ্রেম যথেষ্ট।

বেদ প্রকৃতি স্বয়ং লিখেছেন। প্রকৃতির তরফ থেকেই বেদ। তখন বলতে আরম্ভ করেছি বেদমন্ত্র .....। একটা লোক, যে কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে উৎসর্গ (আত্মোৎসর্গ) করে, তবে সে দেশকে ঠাণ্ডা করতে পারে। তুমি পার। তোমার ভিতরে সেই সুর আছে। তুমি সেই সুর বাজিয়ে বাজিয়ে সমাজকে এক কর। জাতিকে এক কর। জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাইকে এক কর। **আজ দুর্নীতি চলছে, অন্যায় অবিচার চলছে। শোষণনীতি চলছে। চারিদিকে শোষণে ভরা। শোষণ মুক্ত কথাটা যে ব্যবহার করে এখানে, বেদে সেটাই হল অসুরকে দমন করা। পার্টিতে বলে শোষণ মুক্ত সমাজ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, এই শোষণ মুক্ত কথাটা। এই কথাটা তাঁর সাথে আলাপ করলাম। তারপরে তিনি আজ্ঞাচক্র সম্পর্কে বলতে বললেন।**

আমি বললাম, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার — একে বলে দেহবীণাযন্ত্রের সপ্ত চক্র; সা রে গা মা পা ধা নি। আমার শিষ্য ছিল, ভক্ত ছিল ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (এশিয়ার সুর

সম্রাট)। আফতাবুদ্দিন খাঁ, আলি আকবর খাঁ, তারাও ভক্ত। আলাউদ্দিন লেখাপড়া শেখেনি। তার বাজাত সা সা রে রে গা গা, এই বাজাতো। পরে সে (আলাউদ্দিন) পৃথিবীর মধ্যে বড় বাদক হয়েছিল। আলাউদ্দিনকে বলতাম, 'খাঁ, সাহেব, 'সা'-র অর্থ জান? বলতো 'সা'-র অর্থ' কি?' আলাউদ্দিন দুইহাত দিয়ে দুইকান ধরে বলতো, 'আল্লারে, কইতে (বলতে) পারতাম না। (বাংলাদেশে) কুমিল্লায় শিবপুরে ছিল তার বাড়ী।

আমি বললাম, 'সা'-র অর্থ জানো না? 'সা'-র অর্থ বলতে একটানা ২১ ঘন্টা লাগবে। একটা 'সা'..... বুঝাতে অনেকক্ষণ লাগবে। সা সা করে অনেকক্ষণ আমি তাকে বুঝালাম। তখন তিনি কিছুটা বুঝলেন, 'সা'-র অর্থ কি। আবার আমাদের আদিবেদে আছে, সা রে গা মা পা ধা নি, শুধু শব্দ ধ্বনি নয়। এই দেহের মূলাধার (গুহ্যদ্বার), স্বাধিষ্ঠান (মূত্রদ্বার), মণিপুর (নাভিপদ্ম), অনাহত (বক্ষ), বিশুদ্ধ (কণ্ঠ), আজ্ঞা (দুই ভ্রূ-র মধ্যবর্ত্তী স্থান বা ত্রিনয়ন) ও সহস্রার (মস্তিষ্ক)। এই দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তচক্র বাজাতে বাজাতে সুরে পৌঁছানো যায়। এইটা যাঁরা করতেন, তাদের ১০ হাজার স্তরের পর সা রে গা মা তাঁরা লিখলেন। ১০ হাজার ব্যক্তি, প্রত্যেকেই তাঁরা বিরাট, তাঁদের পরে সা রে গা মা পা ধা নি, ১০ হাজার সিঁড়ির নীচে। এই যে আজ্ঞাচক্র (ত্রিনয়ন) মহাবীণা — এইটাই সুভাষ বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি শক্তির উপাসনা করতেন, শক্তিকে ভালবাসতেন। ত্রিনয়ন যাকে বলে আজ্ঞাচক্র, তারপর সহস্রার তালুতে। সহস্র সূর্যের বীজ রয়েছে, সহস্র সূর্যের ক্ষমতা রয়েছে মস্তিষ্কের এই তালুতে। সুতরাং আমাদের দেবদেবীদের মূর্ত্তিগুলো সাধনার সুবিধার জন্য।

তিনি শক্তির উপাসনা করতেন, শক্তিকে ভালবাসতেন। ত্রিনয়ন যাকে বলে আজ্ঞাচক্র, তারপর সহস্রার তালুতে। সহস্র সূর্যের বীজ রয়েছে, সহস্র সূর্যের ক্ষমতা রয়েছে মস্তিষ্কের এই তালুতে।

১০ হাজার বছর আগে মূর্ত্তিগুলো কিছু ছিল না। কোন মূর্ত্তিপূজার বিধি ব্যবস্থা ছিল না। সেই সময় এই আদিবেদের কথা নিয়ে গোটা ভারতবর্ষের বেদজ্ঞ ঋষিরা ৫০ জন ৫০ জন করে নিয়ে সবাইকে এই শিক্ষা দিতেন। ৫০ জন ৫০ জন করে শিখতো। শিখে নিয়ে তারা কি করতেন? গোটা ভারতবর্ষে ২০০ করে ঘর নিয়ে এক একটা পাড়া হতো। ৫০ জন করে করে তারা সমস্ত পাড়ায় যেতেন। তারা দেড়টা থেকে চারটা

পর্যন্ত বেদ প্রচার করতেন। তখন তো এখনকার মতো স্কুল কলেজ, লেখাপড়া, বইপত্তর, কাগজ-কলম, খাতা পেনসিল ছিল না। তারা বনের গাছপালা, লতাপাতা, মাটি-পাথর, এই সব দিয়েই শিক্ষা দিতেন।

তখনকার বেদ কিন্তু এই বেদ (ঋক, সাম, যজুঃ অথর্ব) নয়। তখনকার বেদ হল আদি বেদ। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, মাটি, আকাশ, বাতাস সবটা নিয়েই হল বেদ। বেদ অর্থই অভেদ। যেখানে নাই ভেদাভেদ তাই হ'ল বেদ। সেই সময় যাঁরা শিক্ষা দিতেন, বেদের স্কুলে পড়ে, তাঁরা বেদের স্তোত্র নিয়ে, বেদের কথা নিয়ে সবাইকে বোঝাতেন। আগেই বলেছি, সেই সময় ৫০ জন ৫০ জন করে গোটা ভারতবর্ষে একই সময়ে সবাই প্রচার কার্যে নামতেন। তাঁরা লাঠি হাতে ছাল, বাকল যা কিছু পরে, সমাজকে তৈরী করার জন্য ঐ গান গাইতেন, বেদের গান আদিবেদের গান। এদিকে ৫০ জন, ওদিকে ৫০, সেদিকে ৫০, আর একদিকে ৫০, এইভাবে সবদিকেই ৫০ জন ৫০ জন করে করে ভাগ হয়ে যেতেন। ওঁরা যখন বলতেন .....বেদমন্ত্র ..... দুইদিকে লাইন ধরে দেশের জনগণ দাঁড়িয়ে থাকতো। তাঁরা বলে যেতেন, সবাই বুঝতো। তাঁরা বলে যেতেন, তোমরা দেশগত প্রাণ হও। 'আমার' বলে এখানে কারও কোন জিনিস নেই; সব আমাদের। ঘর, বাড়ী, মাটি সব আমাদের। রাস্তায় রাস্তায় ফলের গাছ, ফুলের বাগান। যে যার রাস্তায় গাছ লাগাচ্ছে। বাড়ীর সামনে রাস্তা, সব আমাদের। নিজের বলে কিছু নেই। ঐ যে দু'শো দু'শো করে ঘর নিয়ে এক একটি পাড়া হতো, সেখানে ছুতোর মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি থেকে শুরু করে সব ছিল। কারও বাড়ী ভেঙে পড়েছে, সবাই মিলে গিয়ে বাড়ীটা ঠিক করে দিয়ে এল। ঐ বাড়ী আমাদের। এর ওর তার বলে কিছু ছিল না। একান্নভুক্ত পরিবারে যেমন থাকা দরকার, সেইভাবেই তারা অন্যান্যদের সেবা যত্ন করতো। ঐ দু'শো ঘরের ব্যক্তিরা মিলেমিশে চাষবাস করতো। মালপত্র, উৎপন্ন শস্য একজায়গায় রাখতো। যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করতো। প্রয়োজনের বেশী এতটুকু গ্রহণ করতো না। এইভাবেই তারা সমাজটাকে তৈরী করেছিল।

তখন বেদের সমাজে অভাব অভিযোগ ছিল না। অসুখ বিসুখ তখন ছিল না। শুধু নিয়মকানুনের মাধ্যমে সবাই একসুরে সাধনা করতো। তারা

বেদভিত্তিক সমাজ তৈরী করেছিল। সেখানে জাতিগত কোন বিবাদ নেই। নীতিগত বিবাদ নেই। তোমার ধর্ম আর শকুনের ধর্ম এক। কিন্তু এখন তো শকুনকে তুমি একভাবে নিতে পারছো না। তোমার ঘরে কুকুর ঢুকলে সব জল তুমি ফেলে দেবে। তার কোন প্রয়োজন ছিল না। সব জাতির ধর্ম একটা।

জাতিগত বিবাদ কেন? নিজেদের সংস্কারের জন্যই এটা হয়েছে। নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্ম, মনগড়া সংস্কারগত ধর্ম তৈরী করার ফলে আজকের সমাজ এভাবে বিভ্রান্ত। পূজা-পার্বণ, যাগযজ্ঞ এগুলো বেশীরভাগ ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আজ আমার কয়েক কোটি সন্তান। আমি যদি যজ্ঞ করি, শনির পূজা করি, তবে কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারি। এটা আর কিছু নয়, স্রেফ ব্যবসা। যেদিন এটা করবো, সেদিন আমাকে গুলি করে মেরে ফেলে দেবে। মিথ্যা, ছল, চাতুরী, জোচ্চুরি, ভণ্ডামি — যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ যারা করে, বেশীরভাগই এইগুলি করবেই। আমি তো করতে পারছি না। মন্ত্রও জানা আছে। যজ্ঞের মন্ত্র, বিয়ের মন্ত্র, সব মন্ত্র আমি বলে দেব। কিন্তু আমি তো এগুলো করতে পারছি না। তাহলে ফাঁকি দিতে হয়। আমার উপরে যারা নির্ভরশীল, আমার উপরে যাদের নির্ভরতা আছে, তাদেরে ঠকানো ছাড়া আর কিছু নয়। এরা সমাজের পরগাছা স্বরূপ। এই শোষণনীতি বন্ধ করতে হবে। বিচ্ছেদ করতে হবে, সরিয়ে দিতে হবে সমাজ থেকে। এটাই সাম্যের সুর, সমতার সুর। এই সুরই তখন ছিল। সমাজে প্রয়োজনভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল। যে যার ইচ্ছামতন কিছু করতে পারতো না।

জাতিগত বিবাদ কেন? নিজেদের সংস্কারের জন্যই এটা হয়েছে। নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্ম, মনগড়া সংস্কারগত ধর্ম তৈরী করার ফলে আজকের সমাজ এভাবে বিভ্রান্ত।

এখন এখানে যা চলছে, যেদিকে তাকাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পকেট ভারীর ব্যবস্থা। ধর্মের নামে যারা যা কিছু করছে, তারা বেশীর ভাগই পকেট ভারী করছে। এটা আমিও করতে পারি। কিন্তু করতে পারছি না। কারণ বুঝছি, তার মধ্যে সততা বলে কোন জিনিস নাই। আমি যদি কোন শিষ্যকে বলি, 'তোকে রাহুতে ধরেছে'। সেতো

আমি যদি কোন শিষ্যকে বলি, 'তোকে রাহুতে ধরেছে'। সেতো হাত জোড় করে আসবে, 'বাবা, রাহু তাড়াবো কেমনে?'

হাত জোড় করে আসবে, 'বাবা, রাহু তাড়াবো কেমনে?'

যদি বলি, 'ব্যবস্থা আছে। ২০ হাজার টাকা লাগবে। খরচ করতে পারবি?

—পারবো বাবা।

—আমি একটা যজ্ঞ করবো। ওরে (ওকে) একটা যজ্ঞের ফোঁটা দিয়ে বিদায় দেব। আর ঐ ২০ হাজার টাকা আমি নিয়ে নেব। ফাঁকি, সব ফাঁকি। এগুলোর প্রতিবাদ করতে হবে। আজকের সমাজ ধ্বংসের পথে। ধর্মকে বিকৃত করেছে, বিভ্রান্ত করেছে এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা।

ধর্ম হচ্ছে ন্যায়, নিষ্ঠা, সত্য। ধর্ম হচ্ছে যুক্তি। ধর্ম হচ্ছে বিজ্ঞান। ধর্ম গল্প নয়, কল্পনা নয়, ভাব নয়, উচ্ছ্বাস নয়। তুমি পূজা করতে চাও, ঘরে বসে পূজা কর। তোমার কথার প্রমাণ না দেওয়া অবধি কাউকে বলতে পারবে না। আত্মার কথা বলা যাবে না। প্রমাণ না দিতে পারলে, আত্মার কথা কেউ বলতে পারবে না। বেদের যুগে আত্মার কথা যে বলতো, তাকে শাস্তি দিত। হাত-পা বেঁধে রেখে দিত। অযথা কল্পনার কথা বলতে পারবে না। আত্মা কল্পনা করে বলতে পারবে না। তোমাদের ঠাকুরদাদা, তার বাবা, তার বাবা এসে কখনও কড়া নেড়েছে? কখনও দেখেছ যে, মৃত ঠাকুরদাদা এসেছে, দাদু (মায়ের বাবা) এসেছে? সব কল্পনা, গল্প। শ্রাদ্ধ শান্তি যা করছে, না করলেও উপায় নাই। পোষাক পরে করতে হয়। কিন্তু আদতে সত্য বস্তুর সন্ধানে এখনও যেতে পারছে না। বুঝতেই পারছে না, সত্য কি জিনিস। যাই হোক একথা বলে লাভ নেই এখন। তোমরা নেতাজী সম্পর্কে জানতে এসেছ।

নেতাজীর বিষয়ে বেশী কিছু বলতে, চাই না। এ বিষয়ে নীরব থাকতে চাই। আমি চাই, বর্ত্তমান সমাজে নেতাজীর আদর্শটাকে যদি তোমরা বাঁচিয়ে রাখতে পার, তবেই 'নেতাজী আছে', এটাই আমরা জানতে পারবো, বুঝতে পারবো। তোমরা বেদের সুরে, বেদের ধারায়, বেদের চিন্তায় সমাজকে ধরে রাখ। বিপ্লব যদি করতে হয় আত্মরক্ষার বিপ্লব, খুনের বিপ্লব নয়। সমতার

আমি চাই, বর্ত্তমান সমাজে নেতাজীর আদর্শটাকে যদি তোমরা বাঁচিয়ে রাখতে পার, তবেই 'নেতাজী আছে', এটাই আমরা জানতে পারবো, বুঝতে পারবো।

সুরই সাম্যের সুর। এটা বহু বছর আগে, কয়েক লক্ষ বছর আগে ছিল। যারা আজ সাম্যের পূজারী, যারা আজ সমতার পূজারী, তারা যদি সেই আদর্শে কাজ করেন, দেশ হবে ফুলের মতো। দেশে আজও প্রচুর খাদ্য আছে। অভাব সৃষ্টি করছে একশ্রেণীর শয়তান। ইচ্ছে করে অভাব সৃষ্টি করছে। সুতরাং অভাবের হাত থেকে মুক্ত হতে হলে কঠিন হাতে মোকাবিলা করতে হবে। তাই আজ পাঁচ-ছয় কোটির উপরে যে সন্তান করেছি, গুরুগিরি করার জন্য? শিষ্যের মাথায় হাত বুলাবার জন্য? মোটেই না। কেউ বলতে পারবে না, কারও কাছে অর্থ চেয়েছি। কেউ বলতে পারবে না, কারও কাছে দক্ষিণা চেয়েছি। কিন্তু আমি দক্ষিণা নেই না বলে, দক্ষিণা তোমরা দেবে না, বেঁচে গেলাম, তা চলবে না। দক্ষিণা তোমাদের দিতেই হবে। দক্ষিণা আমি কড়ায় ক্রান্তিতে তোমাদের থেকে নিয়ে নেব। কিন্তু সেই দক্ষিণা অর্থ নয়, বস্ত্র নয়, টাকা-পয়সা নয়। সেই দক্ষিণা হচ্ছে আত্মোৎসর্গ। যখন ডাক দেব, সবাই একত্রিত হয়ে শয়তানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই সমাজের বুকে যারা শয়তান, যারা দুষ্ট প্রকৃতির, যারা তোমাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই তোমাদের করতে হবে। তোমরা রাজী আছ কি না বল?

আমি দক্ষিণা নেই না বলে, দক্ষিণা তোমরা দেবে না, বেঁচে গেলাম, তা চলবে না। দক্ষিণা তোমাদের দিতেই হবে। দক্ষিণা আমি কড়ায় ক্রান্তিতে তোমাদের থেকে নিয়ে নেব। কিন্তু সেই দক্ষিণা অর্থ নয়, বস্ত্র নয়, টাকা-পয়সা নয়। সেই দক্ষিণা হচ্ছে আত্মোৎসর্গ।

—হ্যাঁ, বাবা। (সকলে সমস্বরে)।

—ব্যাস্। এটাই যথেষ্ট। এটাই আমার দক্ষিণা। মৃত্যু তো একদিনই হবে। কিন্তু মৃত্যু হওয়ার আগে পর্যন্ত চলবে বাঁচার লড়াই। এই পাঁচ-ছয় কোটি সন্তানের মধ্যে এক কোটি বাদ দেব। বাকী ৫ কোটি লোকের হাতে লাঠি তুলে দেব। লাঠি হাতে দিয়ে বলে দেব, খুন আমাদের ধর্ম নয়। তবে খুন করতে এলে কাউকে ছাড়বে না, এটা মনে রেখে দিও। কাউকে ছাড়া হবে না। সুতরাং আমি এই শিক্ষাই দেব, যাতে সবাই একত্রিত হয়ে মাঠে নামে। বাড়ীর বুড়া-বুড়ী, ছেলেমেয়ে সব একত্রিত হয়ে আমরা নামবো। এই ভারতের বুকে যত শয়তান আছে, যারা সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, যারা সমাজে অভাব সৃষ্টি করছে, আদর্শের নাম ভাঙিয়ে যারা চলছে, তাদের

বিরুদ্ধে হবে আমাদের সংগ্রাম।

নেতাজীর সাথে এই নিয়ে অনেকক্ষণ আমি আলাপ করেছি। তিনি বলেছেন, আপনার সেনাবাহিনী তৈরী করুন। M. N. Roy (মানবেন্দ্র নাথ রায়) বলে একজন ছিলেন, খুব জ্ঞানী, দক্ষ, শিক্ষার দিক থেকে যার তুলনা হয় না, সেই M. N. Roy এসেছিলেন আমার কাছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, আপনি ধর্ম এবং বাস্তব এক করে দিয়েছেন। আমি বলি, ধর্ম বাস্তব ছাড়া নয়। ধর্ম বস্তু ছাড়া নয়। ধর্ম কল্পনা নয়। ধর্ম গল্প নয়। এটা মনে রেখে দিও। আমি ৫ বছর ৩ মাস বয়স থেকে দীক্ষা দিচ্ছি। তারজন্য আমার নাম দিয়েছে 'বালক ঠাকুর'। নাহলে 'বালক ঠাকুর' আমার আশ্রমের নাম নয়। ঐসবের মধ্যে আমি নেই। সবাই 'বালক' 'বালক' বলতো। তাই ঐ 'বালক' কথাটা রয়ে গেছে। বাবা যদি ছেলেকে খোকা বলে ডাকেন, ছেলের ৬০ বছর বয়স হলেও বাবা যদি জীবিত থাকেন ছেলেকে খোকা বলে ডেকে থাকেন। ছেলে কিন্তু তখন খোকা থাকে না। আমিও এখন বালক নেই।

M. N. Roy এসেছিলেন আমার কাছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, আপনি ধর্ম এবং বাস্তব এক করে দিয়েছেন। আমি বলি, ধর্ম বাস্তব ছাড়া নয়। ধর্ম বস্তু ছাড়া নয়। ধর্ম কল্পনা নয়। ধর্ম গল্প নয়।

তোমাদের কাছে আমার একটাই কথা। যে সন্তান করেছি, কথা যখন দিয়েছি, তোমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে থাক, সেইভাবে কাজ করো। সবাই দেখবা কি করে হবে বিপ্লব। কি করে আসবে, কি করে মিশবে, সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না। স্রোতে যখন পড়বে, সব নেমে আসবে, সব নেমে আসবে। চিন্তা করতে হবে না। কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি এটাই দেখতে চাই, আমার বালবাচ্চাদের রক্তে আমার রক্তে এক হয়ে যাক। আমি সেইভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি, সেইভাবেই চলছি। আমি কোন রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলি না। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলি না। আমরা বলি, আমাদের বিরুদ্ধে। আমরাই সমস্তদিকে সব কিছু নষ্ট

সবাই দেখবা কি করে হবে বিপ্লব। কি করে আসবে, কি করে মিশবে, সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না। স্রোতে যখন পড়বে, সব নেমে আসবে, সব নেমে আসবে। চিন্তা করতে হবে না। কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি এটাই দেখতে চাই, আমার বালবাচ্চাদের রক্তে আমার রক্তে এক হয়ে যাক।

করছি। তার সমাধান আমরাই করবো। অপরাধ সহ্য করাটাও অপরাধ। সুতরাং এই করো।

নেতাজী যদি জীবিত থাকেন, এতদিন কেন তিনি আসছেন না? কেন তিনি গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন? অনেকের মনেই এই জিজ্ঞাসা রয়েছে। ভয়ে নয়, ভীতিতে নয়। তিনি আসামী নন যে লুকিয়ে থাকবেন। তিনি বৃহৎ উদ্দেশ্যে বৃহৎ কাজেই নিজেকে উৎসর্গ করে নিজের পথ বেছে নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা জানতে চেয়ো না যে, তিনি কবে আসবেন? তিনি কেন আসছেন না বা আদৌ আসবেন কি না, সেই প্রশ্ন কেউ করবে না। শুধু জেনে রাখো, তিনি হিতাকাঙ্খী। এটাই জেনে রাখো। আমরা সবসময় তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করবো। তিনি মারা গেছেন বা আছেন বা নেই, একথা কিচ্ছু বলবো না। বলবো সেদিন, যেদিন প্রমাণ দিতে পারবো বা সামনে এনে পৌঁছিয়ে দিতে পারবো। সেদিন বলবো, তোমাদের সব কথা। নেহরুজী আমাকে নেতাজীর সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি বলেছি, পণ্ডিতজী, তোমার কোন কথা যদি আমাকে বলো, সেটা কি ফাঁস করে দেওয়া উচিত?

—না।

—তবে আমাকে বলতে বলছো কেন? নেতাজীর সই করা কাগজ দেখেছে। দেখে, আশ্চর্য হয়ে গেছে। বলতে পারবে না, নেতাজী মারা গেছে।

রাধাকৃষ্ণন নেমন্তন্ন করেছে। সেও বলেছে আমাকে, তুমি নেতাজী সম্পর্কে জানো। I know you know. গান গেয়ে আমারে শুনাইছে। তারপরে রাজেন্দ্র প্রসাদ President, তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে গেল। তিনি অনেক পড়াশুনা করেছেন, অনেক কথা বললেন। সকলেরই নেতাজী সম্পর্কে সন্দেহ। প্রত্যেকের মনে দ্বন্দ্ব। তিনি কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন। শাহনওয়াজ খান তো রোজই বিরক্ত করতো। তার বাড়ীতে ছিলাম তো। তোমাদের মনেও দ্বন্দ্ব রয়ে গেল। আমি দ্বন্দ্বে ঝোলাচ্ছি। দ্বন্দ্বের সমাধান যদি করতে পারি, কোন দিন যদি সম্ভব হয়, সেদিন আমি বুক ফুলিয়ে তোমাদের কাছে বলবো নেতাজীর সব কথা। এর আগে পর্যন্ত দ্বন্দ্বেই থাকো।

দেখ, এখানে এরা যা খুশী বলে বলুক। এরা কখনও মারে, কখনও

আমাদের নেতাজী আমাদের কাছে জীবিত। ব্যস্। আমাদের নেতাজী আমাদের কাছে জীবিত। তাদের কাছে যাই থাক।

বাঁচায়। এদের সাথে তর্ক করে লাভ নেই। তর্ক করতে গেলেই আসল বস্তু বেড়িয়ে যাবে। চুপচাপ থাকো, এই নিয়ে মাথা ঘামাতে যেও না। এই লেখাটা (নেতাজীর সই করা চিঠি) সামনে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিও। কালিটা প্রমাণ করুক। তাহলেই বুঝতে পারবে, কোথায় আছেন। আর কিছু লাগবে না। আমরা এই নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। কথা বললে সময় নষ্ট। গুরুত্ব দেওয়া হয় তাদের বিষয়ে। এগুলো মনের থিকা (থেকে) বাতিল করে দাও। এই নিয়ে আলোচনা করবে না। আমাদের নেতাজী আমাদের কাছে জীবিত। ব্যস্। আমাদের নেতাজী আমাদের কাছে জীবিত। তাদের কাছে যাই থাক। লালবাজারে গেলাম, নেতাজীর ফটো নাই। একজন D.C. আমাকে চেয়ারে বসতে বলছে। আমি চেয়ারে বসবো? নেতাজীর জন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের জন্য তিনি একজন বৃহৎ কর্মী ছিলেন। তাঁর কোন ফটো নাই, কিচ্ছু নাই। কোন চিহ্ন নাই। সেখানে চেয়ারে বসতে আমার ইচ্ছা করলো না। আমি মাটিতে বসেছিলাম। একথা কাকে বলবো? কে শুনবে? যাদের হাতে ক্ষমতা আসে, গ্রাহ্য করে না কাউকে। যার হাতে ক্ষমতা আসে, এটাই দেখা যাচ্ছে। তোমাদের মনে লাগছে; মনেই লাগতে দাও। চিৎকার করলে সময় নষ্ট। আমাদের নেতাজী আমাদের কাছে জীবিত, এটাই হ'ল কথা।

আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমরা বেদের পূজারী হও। দেশের জন্য, দশের জন্য যাতে আত্মোৎসর্গ করতে পার, সেইভাবে চিন্তা কর। আর কারো কানকথা শুনবে না, গুজবে কান দেবে না। যে যা খুশী বলে বলুক, সব সময় ভাববে, 'বাবা কি বলেন। আমরা বাবা (শ্রীশ্রীঠাকুর) পেয়েছি'। বাবার কথার উপর নির্ভর করে তোমরা চলবে। পরিষ্কার কথা । অন্য কোন কথা নাই এখানে। বিদ্রূপ করা সহজ, সমালোচনা করা সহজ। একটা জিনিস গড়ে তোলা খুব কঠিন। আমি জোর গলায় বলছি, ৬ কোটি লোক ভারতবর্ষে আর কার আছে, বল? এটা আমার অহঙ্কারের কথা নয়। গৌরবের কথা। ৬ কোটি লোককে আমি একত্রিত করতে পারবো। সামান্য কথা নয়, ৬ কোটি লোক, এখানে মৃত্যুর মাঝে আজ আছে কাল নাই। দীক্ষা দিয়ে সম্পর্ক করে নিয়েছি, যোগাযোগ করেছি। এদিক ওদিক করলে

চুলের মুঠির ধরে নিয়ে আসবো। এজন্য দীক্ষা। যে স্কুলে ভর্ত্তি হয়, সে স্কুলের মাষ্টার ছাত্রকে বেত মারতে পারে। অন্য স্কুলের ছাত্রদের মারতে পারবে না। আমার স্কুলে আমার সন্তান হয়েছ, আমার পেটের বাচ্চা হয়েছ। সুতরাং এদিক ওদিক চলবে না। টেনে নিয়ে আসবো। মনে করো, ৫০০ লোকের মধ্যে বসে আছ, যদি প্রয়োজন মনে করি, আমার সন্তানকে আমি টেনে নিয়ে আসবো। সুতরাং তোমরা সেই ভাবে প্রস্তুতি নাও। সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। যারা ভাল কাজ করবে, যে পার্টি, যে সম্প্রদায় ভাল কাজ করবে, তাদের সাথে সহযোগিতা করবে।

কোন ভাঁওতায় কাজ দেবে না। ভাঁওতা কথায় চলবে না। প্রত্যক্ষ দেখতে হবে। প্রত্যক্ষ বুঝতে হবে। প্রত্যক্ষভাবে কাজ করবে। তবেই সেই কাজে সফলতা আসবে। তা নাইলে উপায় নাই। যা চলছে চারিদিকে শুধু ভাঁওতাবাজী। বেশীরভাগই ভাঁওতাবাজ আর ক্ষমতালোভী। আমি ক্ষমতার লোভ করতে চাই না। আমি নেতা বনতে চাই না। রাজনীতির কোন গদী আমি নেব না। গদী আমি চাই না। আমি চাই সমাজকে সুস্থ করতে। পশ্চিমবঙ্গে যদি ইলেক্শনে দাঁড়াই দেখবে কি রকম ভোট পড়ে। একচেটিয়া নিয়ে নেব। আমাদের তো লেখাই আছে, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা। যার যেটা ইচ্ছে ভোট দেবেন, তাহলে দেখবে, কিরকম ভোট পাই। আমাদের ভোটের দরকার নাই। যাক এখন আশীর্বাদ করছি, শরীরটা ভাল নয়। ভাল কিছু করার ইচ্ছা ছিল। এখন এই থাক।

এখানে সাংবাদিকরা আসছেন। আমার বংশ পরিচয়ের জন্য লিখে পাঠাচ্ছেন।

বংশ পরিচয়ঃ আমার মা আর গৌরাঙ্গদেবের মা এক বাপের ঘরের। মহাপ্রভুর মা ছিলেন শচীদেবী। শচীদেবীর বাবা ছিলেন নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ছেলে হলেন বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তী, গৌরাঙ্গদেবের আপন মামা। বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তীর একাদশ উত্তরপুরুষ হলেন অম্বিকানাথ বিদ্যাভুষণ। তাঁর কন্যা চারুশীলা দেবী (দ্বাদশ উত্তরপুরুষ) হলেন আমার মা। বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তীর ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষে ভাগিনেয় রূপে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। অম্বিকানাথ বিদ্যাভুষণের পুত্র হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ (বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তীর দ্বাদশ

উত্তরপুরুষ) হলেন আমার আপন মামা। সুতরাং মহাপ্রভুর মামাবাড়ী, আমার মামাবাড়ী এক মামাবাড়ী।

মহাপ্রভু ত্যাগের মাধ্যমে সমাজকে সেবা করেছেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমাজকে সেবা করেছেন। তাঁর রক্ত যখন বহন করছি, এই রক্ত তোমাদের মধ্যেও আছে। দীক্ষা যখন দিয়েছি, এক রক্ত হয়ে গেছে। আমাদের মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য যাতে সফল করতে পারি, তাঁর আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, সেদিকে চেষ্টা করে চলেছি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি এক করতে চেয়েছিলেন সবাইকে। সুতরাং যে রক্ত বহন করে তোমাদের কাছে এসেছি, সেই রক্তের মর্যাদা যাতে রক্ষা করতে পারি, সেই চেষ্টা করেই এগিয়ে চলেছি। দেরী হয়ে যাবে। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। আজ এই থাক।

যারা থাকার প্রয়োজন বোধ করো থাকবে। যারা যাবার প্রয়োজন বোধ করো যাবে। তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। কষ্ট স্বীকার করে তোমরা যে এসেছ, এটাই যথেষ্ট। তোমরা গুছিয়ে নেবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমস্ত পৃথিবী পোড়াতে একটি দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট

সি.আই.টি. বিল্ডিং, কোলকাতা
৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৫

আমাদের এই জীবনের যাত্রাপথে নানা অবস্থার মাঝে প্রতিমুহূর্ত্তে হুঁচোট খেয়ে এগিয়ে চলেছি। আমরা বেদের পূজারী, জ্ঞানের পূজারী, গুণের পূজারী। আজ বেদের কথা বলার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। বেদ সর্বসংস্কার মুক্ত। বেদ হচ্ছে আকাশ। বেদ হচ্ছে মাটি, বেদ হচ্ছে দেহ। সেই বেদের কথা আমাদের কথা। এখানকার তথাকথিত সংস্কারগত ধর্মে বেদের অর্থ বিকৃত করা হয়েছে। ফলে বেদকে নিয়ে ধর্মকে নিয়ে জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বেদ ধর্মে বিভেদ করে নাই। বেদ সমস্ত জাতির সুর। আমার সেই বেদকে সম্বল করে এগিয়ে যাব।

আমরা যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছি, সেটা বেদের ক্ষেত্র। সেই মাটিতে কোন অভাব নাই। আজ ধর্মে এত গোলযোগ; ধর্মে এত গলদ দেখা যাচ্ছে কেন? ধর্মে কোন বিকৃত অর্থ থাকতে পারে না। এক শ্রেণীর ব্যক্তি ধর্মের নামে ব্যবসা করতে গিয়ে বেদের অর্থ বিকৃত করেছে, ধর্মের অর্থ বিকৃত করেছে এবং সমাজকে সংস্কারের গণ্ডীতে এনে ফেলেছে। আজ সমাজকে যে অবস্থায় এনেছে, তারজন্যই আজকের সমাজ দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু আগে যারা শাস্ত্র বুঝেছে, যারা পণ্ডিত, যারা শাস্ত্র লিখেছে, বেদ বুঝেছে, সমাজের এই অব্যবস্থা তারা চিন্তাও করেনি। আমি বেদের সুর নিয়ে এসেছি। সেই বেদে আছে সমতার সুর। ভারত ধর্মের দেশ, বেদের দেশ। বেদের অর্থ বিকৃত করে সমাজকে বিপথে চালিত করেছে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী। কিন্তু তারা যদি বেদের বিরাট অর্থের সহিত নিজেদের যুক্ত করতো, বেদের

অর্থের সহিত হাত মিলাতো, আমাদের এই রকম অবস্থা আসতে পারতো না। নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থে তারা এই রকম করেছে। নিজেদের দলীয় স্বার্থে এইরকম অবস্থা নিজেরা সৃষ্টি করেছে। আমরা বেদের সুরে সুর দিয়ে চলবো। সকল দেশ আমাদের ধর্ম নিতে পারছে না। কারণ সংস্কার ঢুকে গেছে। আমরা সকল দেশের সকল জাতিকে এক নীতিতে এনে সমতার সুর নিয়ে চলতে চাই।

আজ সমাজের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি, বলার কিছু থাকে না। সমস্ত ভেজালের মূলে নীতি বিচ্ছেদ, জাতি বিচ্ছেদ। দলীয় স্বার্থের জন্যই এই অবস্থা হয়েছে। তদানীন্তন সরকার যদি নজর দিত, অনেক সমস্যার সমাধান হতো। সেই ধর্মের উপর নির্ভর করে, বেদকে অবলম্বন করে আমাদের সমাজ শুধু ধর্ম ধর্ম করে চিৎকার করছে। আদর্শ পালনের কথা খুব কম। যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আজ বলার কিছু নেই। কারণ দেশপ্রিয় পার্কে বসে শুধু আলোচনা করে কি হবে? আমাদের জাতিগত, নীতিগত ত্রুটির জন্যই আমরা এত অভাবের সম্মুখীন হচ্ছি। আজ চারিদিকে পৃথিবীতে ঘোলাটে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। দেশ কোন্‌দিকে যাচ্ছে?

ধর্ম শুধু চক্ষু বোঁজা নয়, জপ করা নয়, জপ তপ নয়। ধর্ম হচ্ছে সমস্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে এক যোগাযোগসূত্রে আবদ্ধ হওয়া। ধর্ম কাম, ক্রোধ ছাড়া নয়। ধর্ম পিতা, মাতা, ভাই ছাড়া নয়। ধর্ম স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ছাড়া নয়। ধর্ম কর্ত্তব্য ছাড়া নয়। আমরা অনাহারে অনাশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছি। শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে আছি। বাস্তব সত্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়েই ধর্মের সৃষ্টি হল। আমাদের ধর্ম বেদের ধর্ম। আজ ধর্ম কল্পনায় চলে গেছে। সমস্ত দিকে সমতার দৃষ্টি রেখে চলাই ধর্ম। সমাজের অভাব অভিযোগ দেখা, সমাজের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা, এটাই বেদের শিক্ষা। আমরা সেই বেদের দণ্ড নিয়ে সমস্ত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হবো। আজ চারিদিকে তাকালেই দেখবো অভাব। এই অভাবের কারণ কি? সেই কারণের মূলোচ্ছেদ করবো। বেদের দণ্ড নিয়ে আমরা অন্যায়কারীদের কষাঘাত করবো। কোন দলীয় স্বার্থ নিয়ে বেদ নয়। সমস্ত কিছু নিয়েই বেদ। সূর্য বেদ, আকাশ, মাটি সমস্ত বেদ, এই দেহ বেদ, জগৎ বেদ, মন বেদ। এই পরিব্যাপ্তমান বিশ্বের সমস্ত সমস্ত কিছু নিয়েই যেখানে বেদ, সেখানে বলার

কিছু নেই। এই অভাব অভিযোগের মাঝেই আমরা নির্যাতন ভোগ করে যাচ্ছি। আমাদের ডানা ভারী হওয়াতে খাঁচার পাখী খাঁচাতেই রয়েছি। সংস্কারে উড়তে পারছি না। কিন্তু আমাদের উড়তে হবে বেদকে অবলম্বন করে। **বেদকে স্মরণ করে তারই ব্যাখ্যা নিয়ে আমরা যদি এগিয়ে যাই, আমাদের কেউ রুখতে পারবে না। আমাদের স্বার্থ মাটির স্বার্থ, বেদের স্বার্থ। আমরা সঙঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবো। এত বাধা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে চিন্তা করা যায় না। একজন লোক যদি বৃহৎ কাজে নামে কত বাধা, অপবাদ, কলঙ্ক সহ্য করতে হয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই উপলব্ধি করছি। তবুও হাল ছাড়লে চলবে না।** এক বছর পরে এখানে এসেছি। এক পা ভিতরে, এক পা বাইরে। কোথাও সত্যি এতটুকু নাই। ছল বল কৌশল আর মিথ্যা প্রবঞ্চনায় জর্জরিত। যে সত্য কথা বলে সে যে কত বড়। নিজের সরকারের দরজায় যাই, যেখানে যাই সত্যের দরজা নাই। এরকম জায়গা আর দেখি নাই। শুধু সহ্য করে যাচ্ছি।

পারমিট, লাইসেন্স দিয়ে যে দেশ লোকের মুখ আটকায়, সে দেশ দেশ নয়। সরকারের পুলিশ রক্ষক হবে, তা নয়। সেই পুলিশ থাকে আমাদের আটকাবার জন্য। ভগবান কোথায় কিছু বলার উপায় নেই। ভগবান সম্পর্কে সঠিক ঠিকানা কেউই দিতে পারছে না। **যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তারা সাময়িক প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে। কিন্তু যারা সত্য কথা বলে, তাদের মধ্যে কেহ পৃথিবীর ইতিহাসে সহজভাবে জীবনযাপন করতে পারে নাই। যারা সত্যের পথে চলে, দেশকে ভালবাসে, তাদের হুঁচোট থেকে হয়। কিন্তু তাদের জয় অনিবার্য। আজ দেশের যা অবস্থা এসে দাঁড়াচ্ছে, তিনটা শক্তির সমন্বয়ে ভারত যুক্ত হবে, সেই বিশ্বাস রাখি। আজ যারা আমাদের বন্ধু তারা প্রকৃত বন্ধু নয়। ভারতে শত্রুর প্রভাব যে বিস্তার হচ্ছে, তারজন্য আরও দুর্দশার সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা আমাদের নিজেদের সৃষ্টি। দুর্দশা এবং দুর্দ্দিন আরও এগিয়ে আসছে। সমস্ত দিকে যে গোলমাল হচ্ছে, একটা বৃহৎ শক্তির সহিত যুক্ত হওয়ার জন্যই, আর বলবো না।** এই শক্তি যার কথা আগে বলেছি, দেশপ্রিয় পার্কে বলেছি, এরজন্যই বিরাট বাধার সৃষ্টি হয়েছে। বৃহৎ শক্তির কথা বলতে নেতাজীর কথা এসে যায়। সে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। আজ ধর্মের কথা কি বলবো। বক্তৃতা দিতে আর ইচ্ছা হয়

না। এমন অবস্থা হয়েছে, রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা একত্র হয়ে কাজ করি। আসুন আমরা মার্চ করে যাই। আজ গভর্ণমেন্ট লিমিটেড কনসার্ণ হয়েছে।

বেদেই বলছে, যেই দেশ সমাজের মানুষকে শোষণ করছে, সে যেই হোক গভর্ণমেন্ট হোক বা বাপই হোক, যারা সমাজের কলঙ্ক, যারা শত্রু, তাদের অপসারিত করতে হবে। সেদিন বলেছিলাম সুভাষ বোসের কথা বলা আর বন্দেমাতরম্ বলা, একই কথা। ছয় মাস অগেও আমাকে বলেছে, 'বলুন নেতাজী কোথায় আছে? আমরা পত্রিকায় আপনার নাম বের করে প্রচুর প্রশংসা করছি।'

আমি বলি, একটু বলেই ১২ কাঠার ধাক্কা আজও চলেছে। সুভাষ বসু যেভাবে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে, এমন তো আর কাহাকেও দেখি না। সুভাষ বোস আজ আসলে পাকিস্তান ছেড়ে দেবে ওঁর হাতে। কিন্তু দরজা কোথায় একত্র হবার? সেই প্রচেষ্টা কোথায়? বলার কিছু নাই। বাচ্চা বয়স হতে কাজে নেমেছি। লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে চলেছি। বেদে আছে, পৃথিবীতে যত জীব সৃষ্টি হয়েছে, প্রত্যেকেরই পৃথিবীর স্তন্যপান করার অধিকার আছে। তাতে বাধা দেয় যারা তারাই শত্রু। বেদ বলছে, কোন লোকেরই না খেয়ে মরার অধিকার নাই। পৃথিবীতে কেন অভাব এলো? এখানে খাওয়া-পরার কোন অভাব থাকবে না। অভাব নিজেরাই সৃষ্টি করেছি আমরা। পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমরা বেদের কথা বলছি। রাজনীতির কথা বলছি না। বেদকে স্মরণ করে আমরা কাজ করবো। বেদকে বিভ্রান্ত কেন করছে? অভাব আসবে না কেন? লক্ষ লক্ষ মণ চাউল রয়েছে, গাছ উঠে গেছে। গুদামে চাল পচে যাচ্ছে। তবু মানুষকে দেবে না। লক্ষ লক্ষ লোক আমার আছে। সব খবর আসে আমার কাছে। এই অভাব সৃষ্টি করছে কারা? আমরা যদি ধর্মে থাকি, আমাদের দরজা ভেঙে চাল বের করে নেবার কথা। যারা সঞ্চয় বৃদ্ধি করে সমাজে অভাবের সৃষ্টি করছে, তারাই অসুর। নদীর উপর দিয়ে জাহাজ চলেছে। ঝড় উঠলে বলে সব একভাবে থাকো। বেদ বলছে, একমুঠো সঞ্চয় করার কারও অধিকার নেই। সমবন্টনের নীতিতে সকলে ভাগাভাগি করে খাও। সুতরাং এই অভাব যারা সৃষ্টি করেছে, তারাই সমাজের ক্ষতিকারক। আমরা কোন রাজনৈতিকের দিকে

নই; সরকারের বিপক্ষে নই। আমরা মাটির স্বপক্ষে। বেদকে সম্বল করে সেই পারাপারকে ভাঙবো। সেই দিকে এগিয়ে যাবো। জাতির মধ্যে স্বাধীনতার সেই সুন্দর স্ফূরণ আজ আর নেই। ভাইগণ, আসুন আমরা সকলে একত্রিত হই। এক সুরে এক তালে তালে আমরা এগিয়ে যাই। বড় বাধা। আমার ৫/৬/৭ বছর বয়স হতে আমি বেদ নিয়ে দেশকে ঢেলে সাজাবার জন্য চেষ্টা করছি। আমার বিরুদ্ধে সব উঠে পড়ে লেগেছে। সেই কেস আমার বিরুদ্ধে করেছে। শৌলমারীর সাধু সেই ৪০৬ ধারার কেসে পড়েছিল। সেখান হতে লোক এল। আমি গিয়ে সেই কেস মিটিয়ে এলাম। আর কিছুদিন বাদে সেই ৪০৬ ধারা আমার উপর ফেলে দিল। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এই কেসে ছিল। যে কেস করেছিল, মনোরঞ্জন ভদ্র আমার শিষ্য হয়। সে হাজার হাজার টাকা পাচ্ছিল এই কেসের জন্য। আমি গিয়ে তাকে বলি, 'তুমি কেন এই ভুল করছো?' একদিন নেতাজী নিশ্চয়ই এখানে ছিলেন। নতুবা এখানে এত সতর্কতা, এত পাহারা কেন? তিনি তো নিজে জমি মাপতে যান নাই। যাই হোক, কেস উঠিয়ে নিল। তার কিছুদিন পর শ্যামবাজার বাড়ীতে আমার বাবার সামনে পাঁচটা পুলিশ ভ্যান, সঙ্গে সমস্ত প্রেসের রিপোর্টররা। জহরলাল নেহরু এ্যারেষ্ট হলেও এরূপ হতো না। ১৪ বছর আগে যাদবপুরের কোথায় ১২ কাঠা জমি, ১২০০ টাকা যার দাম নয়, সেই জমি নাকি আমি মেরেছি। আমার ৫০ লক্ষ শিষ্য। টাকা নিলে আমি ২০/২৫ লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারি। **একজন লোক যদি সত্যপথে সৎভাবে জীবনযাপন করে বিবেকের সুরে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে, তার কখনও পতন হয় না। অন্য কোন সাধু এরকম বদনামের পর এত লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে মীটিং করতে পারতো না। যে কোন সাধু এরকম বদনাম নিয়ে ডুমুর হয়ে যেত। আমি সমগ্র জাতির জন্য কাজ করছি। বেদের কাজ করছি। যে জন্য আমায় ধরেছিল, তার থেকে সসম্মানে মুক্তিলাভ করেছি। যে কাজে আমি নেমেছি, তাতে আমি গৌরববোধ করি। কারণ সুভাষ বোসকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, যার জন্য শিশু বয়স থেকে এসেছি সমাজের মধ্যে। আমি স্বাধীন সংস্কারমুক্ত সুন্দর সমাজ সৃষ্টি করতে চাই।**

আমরা সেই বেদকে অস্ত্র করবো, সেই বেদকে অবলম্বন করবো।

কোনরকম দলীয় কথা নয়। আপনারা সেই বেদকে অবলম্বন করুন। বেদ হচ্ছে আকাশ, যা হতে সৃষ্ট এই জীবকূল। হুঁশের মধ্যে আছে বলেই তো মানুষ। আমরা বেদের পূজারী। আসুন, আমরা সেইভাবে একত্র হয়ে এগিয়ে যাই। বহু বাধা, বহু নির্যাতন আমার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। রাস্তার উপর রোলারের ন্যায় বয়ে চলেছে। বিদ্রুপ করছে, করুক। কাঁহাতক বিদ্রুপ করবে। ঝড় যখন হয়, কত দেশ উড়িয়ে নেয়। সমস্ত পৃথিবীকে পুড়িয়ে দিতে একটা দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট। আমি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি। আমি ন্যায়ের পূজারী। আমি সত্য ছাড়া এতটুকু অন্য কিছু বলি না। আমি যা জানি তাই বলি। যা জানি না, তা বলি না। আমি সত্যকে ভিত্তি করে, নীতিকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাব। নেতাজী আছেন। তিনি সম্পূর্ণ ভাল ভাবেই আছেন এবং তাঁর ইঙ্গিত দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তাঁকে কেউ রুখতে পারবে না, সেটা আমি বিশ্বাস করি। আমি কাউকে আমার কথা বিশ্বাস করতে বলি না। দেশের উপর যে ঘোলাটে অবস্থা আসছে, তা কেটে যাবে। তারপর আরও কিছুটা নির্যাতন সহ্য করতে হবে। কিন্তু মোড় ঘুরে যাবে। আজ আমাদের দুর্দিন। আমাদের জওয়ানরা কিভাবে প্রাণ দিয়েছেন। সেই হিসাবে নেতাজী সুভাষ বোসের ভিতরে তারই ইঙ্গিত কাজ করছে। তিনি আছেন, তবে তিনি কবে আসবেন বলি না। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান এক হয়ে যাবে। দেশের খাদ্য সমস্যা মিটে যাবে। এখন জ্বলে ওঠার আগের বাতি এটা। ভারতে পরম শান্তির ঢেউ, শান্তির সাড়া আসবে। ভারতের জওয়ানরা যারা প্রাণ দিয়েছেন, তারা সত্যিকারের দেশকর্মী। তাদের কথা স্মরণ করি। তারাই বেদের কাজ করছেন। আমরা যেন তাদের আত্মত্যাগ স্মরণ করি। আর নেতাজীর কথা স্মরণ করি। তাঁর দান বড় দান। আমাদের দেশ জাগরণের মূলে নেতাজী। দেশ কোন্ দিকে যাচ্ছে? এর মাঝে নেতাজীর ইঙ্গিত আছে, আমার নিজের বিশ্বাস। তিনটে দেশ এক হয়ে যাচ্ছে। এই মিলনের সুরে মোড় ঘুরে যাচ্ছে, এটা নেতাজীর ইঙ্গিত। আর থাক। বলে বলে শুধু চিন্তা করি নানারকম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯

২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান

৩) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬

৪) ১৪২, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭

৫) ১নং তুলসীডাঙ্গা লেন, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬,
ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১

৬) ৩ চণ্ডিগড়, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩

৭) ১১/৫, পর্ণশ্রী পল্লী (পার্ক) বেহালা, কোল - ৩৪
ফোন - ২৪৪৫-৯২২০

৮) কোলকাতা বইমেলা।

৯) অনির্বাণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬

১০) ৩০/৩৫ তারাপুকুর লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী, ফোন - ২৬২২-২৪৯৮

১১) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa

১২) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

		প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩

বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্ এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩